

"বসুমতী"র ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক
লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

প্রাপ্তিস্থান
ইষ্টার্ণ-ল-হাউস
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

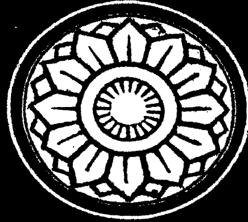
ছয় আনা

প্রথম সংস্করণ
৺মহালয়া, আশ্বিন
সন ১৩৪৬ সাল



চিত্রশিল্পী—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

Printed & Published by G. B. Dey
at the Oriental Printing Works,
18, Brindabun Bysack Street, Cal.
Engraved by N. Dey & Co.
150 & 152/2, Manicktola St., Cal.



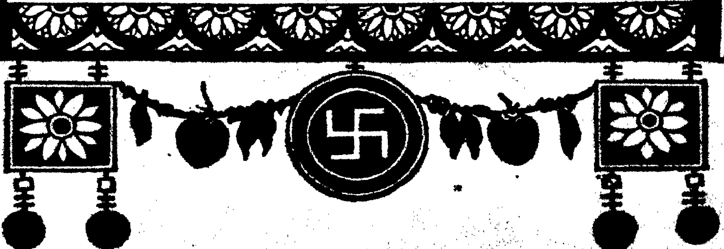


উপহার



বইখানি —

1945



অনুক্রম





কিন্নরদেশের রাজকন্যা

এক রাজার তিন পুত্র। দুই পুত্রের বিয়ে হয়েছে। রাজা ছোট ছেলের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন, কিন্তু বিয়েতে তার অমত দেখে রাজার বড় দুঃখ।

একদিন কনিষ্ঠ রাজপুত্র হিরণকুমার অন্দরের বাগানে বেড়াচ্ছে, এমন সময় শুনতে পেলে কে যেন বলছে,—রাজপুত্র, আমায় বিয়ে কর।

হিরণকুমারের কানে কথাটা যেতেই এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেলে না। আবার ঐ কথা,—রাজপুত্র, আমায় বিয়ে কর!

কথাটা কোত্থেকে আসছে জানবার জন্যে রাজপুত্র ওপর দিকে চাইতেই দেখলে এক বানরী ডালে বসে আছে।

প্রথমে গ্রাহ্য না ক'রে রাজপুত্র একমনেই চলেছে. বানরীটা তখন গাছ থেকে নেমে হিরণকুমারের সামনে এসে ঐ কথা বলতে লাগল— রাজপুত্র, আমায় বিয়ে কর!

বানরীকে দেখেই রাজপুত্রের আপাদমস্তক জ্বলে গেল। বললে,— দূর্ দূর্ এ আবার কি আপদ এসে জুটল!

আমি আপদ নই রাজপুত্র,—আমি তোমায় ভালবাসি, আমায় বিয়ে কর!

কত বড় বড় রাজা আমার সঙ্গে তাঁদের সুন্দরী মেয়ের বিয়ে দিতে সাধাসাধি করছে তা'তে আমি রাজি নই, আর তুই একটা বানরী তোকে বিয়ে করতে হবে?

ভয় নেই আমার রূপের ছটা দেখে কেউ নিন্দে করবে না বরং সুখ্যাতি করবে।

একটা সামান্য বানরীর মুখে এই সমস্ত অদ্ভুত কথা শুনে হিরণকুমারের অন্তর কৌতূহলে ভরে গেল, বানরীর দিকে চেয়ে বললে,—কেন বল দেখি?

আমার এই বানরী রূপ দেখছ বটে, আমি বানরী নই।

তবে তুমি কে ?

আমি কিন্নর রাজকন্যা।

তুমি যে কিন্নর কন্যা তার প্রমাণ কি ?



মূর্ত্তির মধ্য হ'তে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ......

আমার রূপ দেখে যদি পছন্দ হয়, আমায় বিয়ে করবে বল ?

পছন্দ হ'লে কেন করব না, নিশ্চয় বিয়ে করব।

সহসা সেই স্থান আলোকিত হ'য়ে উঠল। বিদ্যুৎ চমকালে

যেমন একটা আলোর ছটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি এক অসামান্যা সুন্দরীর মূর্ত্তির মধ্য হ'তে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বেরিয়ে আলোয় আলো ক'রে তুলল। রাজপুত্র বিমুগ্ধ নেত্রে সেই অতুলনীয় রূপসুধা পান ক'রে উন্মত্তবৎ হ'য়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সেই অলৌকিক সুন্দরীর রূপ বদলে গিয়ে কুৎসিত বানরী মূর্ত্তিতে পরিণত হল।

রাজপুত্র পাগলের মত হ'য়ে গেল, চিরজীবন অবিবাহিত থাক্‌বার পণ ভুলে গিয়ে বানরীকে উদ্দেশ করে বললে,—তুমি যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর যেই হও না কেন, আজ অবধি তুমিই আমার সর্ব্বস্ব,—তুমিই আমার জীবন-সঙ্গিনী!

রাজপুত্র! এত উতলা হোয়ো না! আমার দু-একটি সর্ত্ত আছে, যদি উহাতে সম্মত হও তবেই আমার সঙ্গে মিলন ঘটবে, নচেৎ আশা ত্যাগ কর!

বল, বল এমন কি কথা আছে! আমি তোমার সকল কথাই রাখব!

শুন রাজপুত্র! আমাদের মিলনের পর সকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি এই বানরী বেশে, তারপর সন্ধ্যার পর হ'তে সারা রজনী কিন্নরীর রূপ ধরে থাকব। এই সর্ত্তে যদি আমায় বিয়ে করতে রাজি হও বল, নচেৎ আমি বিদায় হই।

না—না! আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার সর্ত্তে আমি রাজি। এস, এই উদ্যানেই তোমায় গান্ধর্ব্ব মতে বিয়ে ক'রে অর্দ্ধাঙ্গিনী করি!

এ বিয়েতে হিরণকুমারের বাড়ির কেহ সুখী নয়। রাজা-রাণী, ভাই-বন্ধু, সকলেই ভাবলে হিরণকুমারের মাথা বিকৃত হয়েছে। বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান হ'য়ে কেন সে এমন কাজ করলে, এর কারণ কেউ ভেবে ঠিক করতে পারলে না। কি লজ্জা! কি ঘৃণা! শেষে কি-না একটা বানরীকে বিয়ে করলে।

রাজা তাকে ভায়েদের কাছ থেকে পৃথক ক'রে রাজবাড়ির সংলগ্ন একটা মহলে তার থাকবার স্থান ক'রে দিলেন, হিরণকুমার সেই মহলে বানরীকে নিয়ে রইল।

একদিন দারুণ গ্রীষ্মের রাতে হিরণকুমার ঘরের জানলা খোলা রেখে শুয়ে আছে, বানরীও তার রূপ বদলে অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হ'য়ে, অপূর্ব্ব রূপ লহরী বিকাশ ক'রে শয়ান, এমন সময়ে রাজবাড়ির কক্ষ হ'তে বড় বৌয়ের সেই দিকে নজর পড়ল, দেখল, হিরণকুমারের ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে এক অপরূপ জ্যোতিঃ বেরুচ্ছে। এ জ্যোতিঃ দীপালোক হ'তে ভিন্ন রকম সন্দেহ হওয়ায়, বড় বৌ ধীরে ধীরে দেবরের গৃহের দিকে অগ্রসর হ'ল;—দেখলে ঘুমন্ত দেবরের পাশে এক অলোকসামান্যা যুবতী ঘুমে অচেতন, সেই সুন্দরীর রূপে ঘর আলোকিত হ'য়ে জানলা হ'তে জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

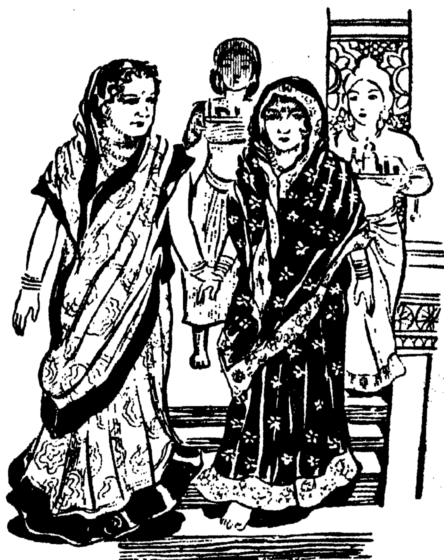
বড় বৌ সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে, নিজের ঘরে এসে তার স্বামী বড় রাজকুমার এবং আর সকলকে দেখিয়ে এই সিদ্ধান্তে পরিণত হল যে, বানরী প্রকৃত বানরী নয়, ছদ্মবেশী অপ্সরী, কিন্নরী অথবা দেবকন্যা। হিরণকুমারের মস্তিষ্ক বিকৃত ব'লে

সকলের যে ধারণা হ'য়েছিল, সে ধারণা তাদের মন থেকে একেবারে মুছে গেল।

পরদিন প্রাতে বাড়ির মধ্যে ঐ নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেল। অন্যদিন বানরীকে দেখে বাড়িতে পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্যে না হোক অপ্রকাশ্যে কত ঠাট্টা, তামাসা, বিদ্রূপ হ'তে থাকত, কিন্তু সেই দিন থেকে সকলের মুখ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। সকলে তাকে মহাসম্ভ্রমে দেখতে লাগল, সেই সঙ্গে হিরণকুমারেরও মান বেড়ে গেল। যে ভায়েরা তাকে ঘৃণায় তফাৎ ক'রে রেখেছিল, তারা আবার নিকটে টানতে আরম্ভ করলে। বানরীরও কপাল ফিরল, তার দুই 'জা' তার হাত ধরে কাছে বসিয়ে কত কি গল্প করতে লাগল। রাণীও আর চেপে থাকতে পারলেন না, বানরীর দু হাত ধরে বললেন,—দেখ বৌমা, তোমার যে বানরকুলে জন্ম নয় তা আমি বুঝেছি, আর গোপন করবার প্রয়োজন নাই। তুমি মানুষ রূপ ধ'রে আমার ঘর উজ্জ্বল কর। তোমার ঘর আলো করা রূপের ছটা দেখলে নয়ন মন সার্থক হয়, প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তুমি বানরী বেশ ছাড়, মানবী বেশে ঘর আলো ক'রে আমাদের সকলকে সুখী কর।

মা! আপনি যা বলছেন, সবই সত্য। রাজ-সংসারে এসে বানরী সাজে থাকি ব'লে আপনারা যে অসুখী তা আমি জানি। আমার কি ইচ্ছা নয় যে, অন্য জায়েদের মত বৌ হ'য়ে সেজে-গুজে থাকি। কিন্তু মা, তা আমার হবার যোটি নাই, আমি দিন-রাত বৌ সেজে থাক্‌লেই, বিপদ মাথার শিওরে এসে দেখা দেবে,—

কখন যে বিপদ ঘটবে তার ঠিক ঠিকানা থাকবে না। তাই বলি মা, আমায় যদি এখানে রাখতে চান আমি যেমন আছি—তেমনি থাকিলেই



চল মা চল, পুষ্করিণীতে স্নান ক'রে ······

ভাল ; তবে যদি একান্তই বৌ সেজে থাকতে বলেন, আমাকে থাকতেই হবে, তবে অদৃষ্টে কি ঘটবে জানি না।

তোমার অদৃষ্ট ভাল বলেই এ ঘরে এসেছ। তোমার মন ভোলান রূপ গোপন না ক'রে যদি তুমি অন্য দু বৌয়ের মত সংসারের কাজ-কর্ম্ম

নিয়ে থাক, তা'হলে সব দিকেই ভাল হয়, তুমি ঐ বানরী বেশ ছাড় ভগবান তোমার ভালই করবেন।

মা! আপনি যখন বলছেন, তখন আপনার কথা রাখতেই হবে। তবে একটা কথা বলে রাখি মা, যদি আমার এমন বিপদ ঘটে যাতে আমাকে ফিরে পাবার আশা না থাকে, সে ক্ষেত্রে আমাকে পেতে হ'লে আপনার ছেলেকে বলে দেবেন, তিনি যেন লোহার জুতো পায়ে দিয়ে উত্তর দিকে সমান যান। যেখানে দেখবেন জুতোর তলা ক্ষয়ে গেছে, সেখানেই আমার দেখা পাবেন।

এ কি অলুক্ষুণে কথা বল্‌ছো মা! ষাট্ ষাট্ ষেঠের বাছা, তুমি আমাদের ছেড়ে কোথা যাবে মা! চল মা চল, অনেক বেলা হয়েছে, পুষ্করিণীতে স্নান করে খেয়ে নেবে চল।

রাণীর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই, বানরী তার কদর্য্য রূপ পরিবর্ত্তন ক'রে এক অপূর্ব্ব সুন্দরীর মূর্ত্তি ধরলে। রাণী আপনভোলা হ'য়ে সেই অলৌকিক রূপসুধা পান করতে করতে বৌমার হাত ধ'রে পুকুরে স্নান করতে নামলেন। কিন্নরী একটি একটি ক'রে সিঁড়ির ধাপে নাম্‌তে নাম্‌তে গলা জলে গিয়ে ডুব দিল। সেই যে ডুব দিল, আর উঠল না। রাণী প্রমাদ গণলেন। অনেক খোঁজা-খুঁজি হ'ল, ডুবুরি ডেকে পুকুর তোড়পাড় করা হ'ল, কিন্তু কিন্নরীকে পাওয়া গেল না।

হিরণকুমার মাকে বললে,—মা, আর দুঃখ করলে কি হবে, যা হবার তা হ'য়েছে, ছোট বৌ কিছু ব'লে গেছে কি?

চোখের জল মুছে মা তখন বললেন,—আর বাছা, যে কথা সে বলে গেছে, সে কি তুই পারবি, সে বড় কঠিন কাজ; সে কথা শুনে কাজ নেই।

কি কঠিন কাজ মা, বলই না শুনি।

বৌমা ব'লে গেছে, তাকে পেতে হ'লে লোহার জুতো পায়ে দিয়ে উত্তরদিকে সোজাসুজি দুচোখ যেখানে যাবে সেই দিকে যেতে হবে। যেতে যেতে যেখানে জুতোর তলা ক্ষয়ে যাবে সেইখানে বৌমার দেখা পাবি। এই কটি কথা ছাড়া বৌমা আর কোন কথা বলে যায় নি।

তবে মা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন সফল হ'য়ে ফিরে আসতে পারি।

তাই যা বাছা, অমন ঘর আলো করা বৌ এমন করে চলে যাবে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আশীর্ব্বাদ করি তুই বৌমাকে নিয়ে নির্ব্বিঘ্নে ঘরে ফিরে আয়!

হিরণকুমার লোহার জুতো পায়ে দিয়ে চলেছে,—বিশ্রাম নাই। অনেক পথ চলতে চলতে জুতোর তলা একেবারে ক্ষয়ে যাবার মত হয়েছে। যখন একটু বাকি আছে, তখন এমন এক স্থানে এসে পড়ল যেখানে আর পথ নাই,—সামনে বিশাল সমুদ্র, জল থৈ থৈ করছে। এদিক ওদিক চাইতেই দেখলে, কিছু দূরে এক সন্ন্যাসী তার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছেন। হিরণকুমার হাঁপাতে হাঁপাতে সন্ন্যাসীর নিকট গিয়ে বললে,—সন্ন্যাসী ঠাকুর, এখানে কিন্নরীর বাস কোথায় বলতে পারেন?

কেন? কিন্নরীকে তোমার কি প্রয়োজন?

কিন্নরী আমার স্ত্রী, তাকে আমি বিয়ে করেছি,—তাকে আমি চাই। সে আমায় বড় ভালবাসে, আমিও তাকে ভালবাসি, আমাদের দোষেই সে ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছে, কিন্তু তার ভালবাসা ভুলতে পারিনি। মাকে ব'লে এসেছে,—আপনার ছোট ছেলেকে লোহার জুতো পায়ে দিয়ে উত্তর দিকে হাঁটতে বলবেন, যেখানে জুতোর তলা ক্ষয়ে যাবে, সেখানে আমার সঙ্গে দেখা হবে। ঠাকুর, এই দেখুন আমি লোহার জুতো পায়ে দিয়ে এত পথ হেঁটে এসেছি, জুতোর তলা এত ক্ষয়ে গেছে যে, নাই বললেই হয়,—যদি সামনে সমুদ্র না পড়ত তা'হলে থামতাম না। এখন আর এগোবার উপায় নাই, কিন্নরীকে কি ক'রে পাব এখন সেই ভাবনাই হচ্ছে; তাকে দেখবার জন্যে মন বড়ই কাতর হচ্ছে; বলুন প্রভু বলুন! কি ক'রে পাব বলুন। বলতে বলতে হিরণকুমার চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল।

সন্ন্যাসী হিরণকুমারের কান্নায় ব্যথিত হ'য়ে বললেন,—আমি তোমার অন্তর দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। রাজপুত্র হ'য়ে এত কঠোর পরিশ্রম করতে কখন দেখিনি,—ধন্য তোমার ভালবাসা। এই ভালবাসার বলেই তুমি কিন্নরীকে পুনরায় লাভ করবে। এস বৎস এস! সুস্থ হও! কিছু জলযোগ কর! আমি তোমার সকল সাধ মেটাব।

হিরণকুমার একটু সুস্থ হ'লে তাকে জলযোগ করিয়ে সন্ন্যাসী কানে মন্তর দিয়ে বললেন,—ঐ যে দূরে ভেড়ার পাল চরছে,

ঐ পালের ভেতর থেকে একটা ভেড়া ধরে নিয়ে আসবে এবং ভেড়াটার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে ঐ ছালের মধ্যে দেহটা মন্ত্র ব'লে ছোট ক'রে ঢুকে পড়বে, তারপর কি করতে হবে সব উপদেশ দিয়ে হিরণকুমারকে বিদায় দিলেন।



ঠাকুর, এখানে কিন্নরীর বাস কোথায় ?……

হিরণকুমার সন্ন্যাসীর কথা মত একটা ভেড়াকে ধরে, তার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে মন্তরে শরীর ছোট ক'রে ঢুকে মাটিতে পড়ে রইল। আর অমনি একটা ঈগল পাখী সেটাকে ছোঁ মেরে শূন্যে তুলে নিয়ে গিয়ে একটা পুকুর পাড়ে ফেলে দিল। হিরণকুমার

মাটিতে পড়তেই সন্ন্যাসীর উপদেশ মত ছালের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে নিজের আকার ধরলে, পাখীটা তাকে দেখেই ভয়ে পালিয়ে গেল।

হিরণকুমার ভেড়ার ছালের ভেতর থেকে বেরিয়ে দেখলে, কিন্নরী পুষ্করিণী থেকে উঠে, কক্ষে জলের কলসী নিয়ে ধীর ও মন্থর গতিতে চলেছে। হিরণকুমারকে দেখেই কিন্নরীর পা আর সরল না। অবাক্ বিমুগ্ধনেত্রে রাজকুমারকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বললে,—তুমি এখানে! কে তোমায় আনলে? কোন্ সাহসে এলে? পালাও! পালাও! বাবা দেখতে পেলে মেরে ফেলবেন! পালাও বলছি পালাও!

রাজকন্যে! তুমি আমায় ছেড়ে পালিয়ে আসবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি! তোমার সঙ্গে যে আবার দেখা হবে তাও যেন স্বপ্ন ব'লে মনে হচ্ছে! ভগবান যখন আমাদের উভয়ের মিলন ক'রে দিয়েছেন, তখন আমার প্রাণ থাক্ আর যাক্ তা'তে দুঃখ নাই, তুমি ভাল থাকলেই আমার সুখ।

রাজকুমার! আমায় বিয়ে ক'রে অবধি একদিনের জন্যে তুমি সুখী হ'তে পারনি! তার ওপর [illegible] যে অপমান সহ্য করেছ তা বলবার নয়! বলব কি, নিজের প্রাণকে তুচ্ছ ক'রে আমার বাড়ি পর্য্যন্ত ছুটে এসেছ! তবু তোমায় আমি সুখী করতে পারছি না,— পাছে বাবা তোমায় প্রাণে মারেন! মাকে তোমার কথা আগেই বলেছি! মা, তোমায় দেখলে সুখী হবেন, সেই এক ভরসা! চল আমার বাড়ি চল,—ব'লে স্বামীর হাত ধ'রে বাড়ির মধ্যে মার কাছে নিয়ে গেল।

মা বললেন,—বাবা, এসেছ ভালই করেছ। এস বাবা—বস। পরে মেয়েকে জলখাবার আনতে ব'লে হিরণকুমারকে বললেন,—দেখ বাবা! তোমায় যে কথাগুলো বলবো, তাতে ভয় পেয়ো না। আমাদের কোন পুরুষে কেউ কখন মানুষকে বিয়ে করে নি, এই আমার মেয়েই যা করেছে। আমার মেয়ে যখন এ কাজটা ক'রে ফেলেছে, তখন তুমি পর নও, বিশেষ আপনার। তবে তোমার শ্বশুর চিরকালটা মানুষের ওপর চটা, তার সামনে তোমায় বার করতে ভয় হয়, পাছে তোমার কোন অনিষ্ট করে বসেন, তাই তোমায় দু-চার দিন লুকিয়ে রাখা হবে, এজন্যে দুঃখ ক'র না বাবা!

না—মা, এ আর রাগের কথা কি! আপনার মেয়ে আমায় বড় ভালবাসে বলেই তার সন্ধানে এতদূর এসেছি, এখন যদি এ প্রাণ যায়, তা'তে দুঃখ নাই। উভয়ের নানা কথার মধ্যে কিন্নরী এসে দেখা দিল। হাতে তার নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফল-মূলের থালা।

কিন্নরীর মাতা, হিরণকুমারকে উদ্দেশ ক'রে বললে,—যাও বাবা ও-ঘরে যাও; অনেক কষ্ট পেয়ে এখানে এসেছ, আহারাদি ক'রে সকাল সকাল শুয়ে পড়।

হিরণকুমার আহার ক'রে শুয়েছে, এমন সময় কিন্নরীর পিতা বাড়িতে প্রবেশ করলে। কিন্নরীর মাতা সুযোগ বুঝে স্বামীকে বললে,—দেখ তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, যদি তুমি কিছু না মনে কর ত বলি।

কি বলবে না বলবে, তা না জেনে একেবারে সত্যি করতে পারব

না। তোমার কথা যদি মনের মত হয় ত কিছু মনে করব না, যদি না হয় খুব মনে করব!

কথাটা ভাল। তবে তুমি যদি উল্টো ভেবে নাও, তবেই গোল। কথাটা অপর কারও নয় তোমারই মেয়ের।

মেয়ের কি হয়েছে, খাচ্ছে দাচ্ছে খেলে বেড়াচ্ছে তার এমন কি কথা আছে, কিছুই ত বুঝতে পারছিনি। তবে মেয়েটা বড় হয়েছে, এই যা কথা,—এ কথা ছাড়া আর ত কিছু ভেবে পাই নি।

ঐ কথাই বটে, মেয়ের বিয়ের কথাই বটে।

তুমি কি মনে কর, আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছি, তা নয়,—কত যে ছেলের সন্ধান করছি তা বলবার নয়, ভাল ছেলে পেলেই বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে ফেলব।

তোমার পায়ে পড়ি রাগ ক'রো না, হতভাগী মেয়েটা একজনকে বিয়ে ক'রে ফেলেছে।

কাকে?

এক রাজপুত্তুরকে।

সব মাটি করেছে। আমার মুখ দেখান ভার হবে। অমন কাজ কেন করলে?

রাজপুত্রের রূপে মুগ্ধ হয়ে।

বল কি? মানুষ এত রূপবান হয় তা আমি জানতাম না। তুমি নিজের চোখে দেখেছ না মেয়ের মুখে শুনে বলছ?

শুনে বলিনি দেখেই বলছি। রূপ ত নয়, যেন স্বর্গের চাঁদ মাটিতে খসে পড়েছে।

তা যতই রূপ থাক মানুষ ত বটে! আমাদের জাতের ছেলে ত নয়!

তা নাই বা হ'ল, আমাদের সঙ্গে খাপ খেলেই হ'ল।



দু'জনে পায়রা হ'য়ে উড়ে যাচ্ছে—কিন্নররাজ বাজপাখী হ'য়ে ......

তা আমি শুনতে চাই নে,—জামাই হোক্ আর যেই হোক্, আমি ওকে নিকেস্ ক'রে তবে ছাড়ব!

তোমার পায়ে পড়ি অমন কাজ ক'রো না,—মেয়ের সর্ব্বনাশ ক'রো না!

করব না ত কি! আমাদের না জানিয়ে হতভাগী অমন কাজ করে কেন?

এ দোষ মেয়ের,—মেয়েকে যা ইচ্ছে তাই কর; নির্দ্দোষীকে নিয়ে টানাটানি কেন? জামাই ত কোন দোষ করেনি।

মেয়েটা ত পালিয়ে এসেছিল, জামাইটা আবার গায়ে প'ড়ে এল কেন?

সেও মেয়ের ইচ্ছেয়। যখন তুজনারই এত ভাব ভালবাসা, তখন বাপ-মায়ের উচিত নয় কি ওদের সুখে সুখী হওয়া।

তা ঠিক। তবে তোমার যখন ওদের ওপর খুব টান পড়েছে, তখন একটা পরীক্ষা না করে জামাইকে ছাড়ব না।

তুমি স্বচ্ছন্দে পরীক্ষা ক'রে দেখতে পার, কিন্তু খামকা মারবার ফন্দী ক'র না, এই আমার ভিক্ষা।

আচ্ছা তাই, পরীক্ষা সম্বন্ধে তোমাকে যা বলতে বলব ঠিক যেন বলা হয়, এদিক-ওদিক হলেই টেরটি পাইয়ে দোব,—বুঝলে!

হিরণকুমার সমুদ্রের ধার দিয়ে চলেছে,—চলতে চলতে গলদঘর্ম্ম হ'য়ে গেছে, দম্ বেরিয়ে যাবার মতন হ'য়েছে; এমন সময় এক আশ্রমে সন্ন্যাসীর দেখা পেলে। সন্ন্যাসীকে দেখেই হিরণকুমার পাগলের মত ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। সন্ন্যাসী দয়ার্দ্র হ'য়ে তাকে তুহাতে তুলে ধ'রে বললেন,—এ সুন্দর রূপ নিয়ে, এ তুর্গম পথে কোথায় চলেছ,—কেনই বা চলেছ?

হিরণকুমার একে একে তার জীবনের সকল কথা,— হ'তে আজ পর্য্যন্ত সকল কথা সন্ন্যাসীকে বললে। সন্ন্যাসী শুনে বললেন,—

দেখ রাজকুমার, তোমার শ্বশুর কিন্নররাজ তোমায় যে পরীক্ষায় ফেলেছে, সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বড় কঠিন। স্বয়ং কিন্নররাজ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে কি না সন্দেহ, তুমি ত সামান্য মানুষ। তাই বলি ঘরে ফিরে যাও,—কিন্নরীর আশা ত্যাগ কর। কেননা তোমায় যেখানে পাঠিয়েছে, সেখানে যেতে হ'লে, প্রথমে এই মহান্ সমুদ্র পার হ'তে হবে; তারপর যে ঢাকটা বাজাবার কথা বলেছে সে ঢাক বাজান বড় সহজ নয়। কারণ সেই ঢাক যাতে না কেউ বাজাতে পারে এজন্যে হাজার হাজার রাক্ষস সেই ঢাককে আগলে বসে আছে। শুধু ঢাক বাজালেই যে নিস্তার পাবে তা নয়, সেই ঢাকের সঙ্গে এক কাস্তে আছে, সেই কাস্তেখানা দিয়ে ঘাস ছুলে, সেই ঘাসে সাপ জড়িয়ে কিন্নররাজকে দিলে তবে তোমার পরীক্ষা শেষ হবে। এ পরীক্ষা বড় সোজা নয়, ভয়ানক পরীক্ষা। কথাটা কি জান, তোমায় মেয়ে দেবে না ব'লেই এই ফন্দি খাটিয়েছে, তা তুমি বুঝতে পারছ ত!

তা ত পারছি। ঠাকুর! আমায় বলে দিন। আপনি যোগী পুরুষ, আপনার শক্তি অসীম। আপনি মনে করলেই এ অধমকে উদ্ধার করতে পারেন, এ আমার বিশ্বাস আছে।

হিরণকুমারের কাতরতায় মুগ্ধ হ'য়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর বললেন,—দেখ কুমার, এই যে মন্ত্র তোমায় দিচ্ছি, এই মন্ত্র উচ্চারণ করলেই

করব না ত

করে কেন ?

ইচ্ছামত যে কোন 'রূপ' ধারণ করে মানুষের মত কথা কইতে পারিবে। এখন তোমায় যা বলি তা শুন। তুমি চিলের আকার ধরে সমুদ্র পার হ'য়ে গেলেই রাক্ষস-বেষ্টিত ঢাক দেখতে পাবে। রাক্ষসদের দেখে ভয় পেয়ো না। তুমি উড়ে গিয়ে ঢাকের ওপরে যে কাঠি আছে সেই কাঠি ঠোঁটে ক'রে নিয়ে, ঢাকটা বাজাবে। বাজিয়ে কাঠিটা ফেলে দেবে। তারপর ঢাকের গা থেকে কাস্তেখানা নিয়ে ঘাস ছুলে তাইতে একটা সাপ জড়িয়ে নিয়েই সাঁ ক'রে উড়ে এসে তোমার শ্বশুর কিন্নররাজকে দেবে।

সন্ন্যাসীর কৃপায় হিরণকুমার চিল হ'য়ে সমুদ্রের ওপারে উড়ে গেল; ঢাক বাজালে, কাস্তে নিয়ে ঘাস ছুলে সেই ঘাস দিয়ে সাপ জড়িয়ে কিন্নররাজের সামনে উপস্থিত হ'ল। কিন্নররাজ এই অসম সাহসিক কার্য্য দেখে থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল। ভয়ে ভয়ে বললে,—হাঁ, তোমায় আমি মেয়ে দোব। বলাও যা, কাজেও তাই করলে। মেয়েকে ডেকে হিরণকুমারের হাতে সঁপে দিলে। উভয়ে পরমানন্দে বাসর ঘরে গেল।

কিন্নররাজ ভয়ে ভয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে, পত্নীকে ডেকে বললে,—দেখ, তুমি যাই বল, ও জামাইকে বাঁচিয়ে রাখা হবে না।

পত্নী শিউরে উঠে বললে,—কেন গো! আবার কি হ'ল! জামাই তোমার কি করলে ?

কি করলে, আবার জিজ্ঞেস করছ, জামায়ের কাণ্ড কারখানা দেখে এখনও নিশ্চিন্ত রয়েছ !

কেন কি হয়েছে, জামাই এমন কি খারাপ কাজ করেছে, যাতে আমাদের প্রাণের ভয় আছে?

আছে বৈ কি,—না থাকলে বলব কেন?

কেন বল দেখি? আমি কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিনে।

আমি ওকে যে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম, সে পরীক্ষা বড় সোজা নয়, তা একবার ভেবে দেখেছ কি? আমি একজন কিন্নরকুলের রাজা, আমাকে যদি কেউ ও কাজ করতে বলে, আমার সাহস হয় না, আর ও ক'রে ফেললে। তাইতে বুঝে নাও, ও মনে করলে আমাদের দফা রফা করতে পারে।

অমন কথা ব'ল না, ও এখন আমাদের জামাই, কত আপনার লোক, কেন অনিষ্ট করবে?

কি করবে না করবে তা কি বলা যায়। এই ত আমি বার বার জামাইকে রাগ ক'রে কত কথাই বলেছি, কত গাল-মন্দ করেছি, কত বিপক্ষে লেগেছি, তা কি জামাই দেখছে না! শেষে এমন পরীক্ষায় ফেলেছি, তাতে ও যে রাক্ষসের মুখ থেকে ফিরে আসবে সে সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না। যখন ফিরে এসেছে তখন আমার ঐ সব কথা মনে ক'রে যদি শোধ তোলে, আমরা তখন কোথায় যাব? সে কথা কি একবার ভেবেছ?

তাও কি কখন হয়? তবে মেয়েটার বড় কষ্ট হবে, হয়ত বা আত্মহত্যা ক'রে বসবে।

আত্মহত্যা করতে যাবে কেন? দু-চার দিন কিছু কষ্ট হবে,

তারপর একটা কিন্নরকে ধরে বিয়ে দিলেই সব দুঃখই ঘুচে যাবে। দেখ মানুষ জাতটা বড় ভাল ব'লে মনে ক'র না, বাগে পেলে আমাদের ঠিক নিকেস্ করবে। তা আমার ভাল রকম জানা আছে।

তাই না কি! তবে আর কি বলব! তোমার যা ইচ্ছে তাই কর, আমি আর কথা কব না!

যে সময়ে কিন্নররাজ ও তৎপত্নী দুজনের মধ্যে এই সব কথা হচ্ছিল, সেই সময়ে কিন্নরী দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল। যখন দেখলে তার মা-বাপ দুজনেই তাদের জামাইকে মারবার জন্যে একমত হয়েছে, তখন কিন্নরী স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে ছুটে হিরণকুমারের কাছে উপস্থিত হ'ল, এবং সংক্ষেপে সব কথা ব'লে দুজনে পায়রা হ'য়ে বাড়ি ছেড়ে উড়ে গেল।

এদিকে কিন্নররাজ জামাইকে বধ করতে এসে, ঘরের মধ্যে কন্যা ও হিরণকুমারকে দেখতে না পেয়ে এদিক ওদিক চাইতেই দেখলে, তারা দুজনে পায়রা হয়ে সাঁ সাঁ ক'রে উড়ে যাচ্ছে। কিন্নররাজ অমনি বাজপাখী হ'য়ে পিছু নিলে। কিন্নরী বাপকে বাজপাখী হ'য়ে তাদের পিছনে আসতে দেখেই প্রাণ ভয়ে তারা কখন চিল, কখন শকুনি, কখন ভেড়া, ছাগল, এইরূপ নানাজন্তুর আকার ধ'রে পালাতে লাগল। কিন্নররাজও কখন সিংহ, কখন ব্যাঘ্র, কখন ভাল্লুক, এই রকম নানা আকার ধ'রে তাদের পিছু নিলে। তারা দুজনে প্রাণ ভয়ে এত জোরে দৌড়াতে লাগল যে, কিন্নররাজ তাদের কিছুতেই ধরতে পারলে না। শেষে তারা হিরণকুমারের রাজ্যে উপস্থিত হ'য়ে, রাজবাড়ির উদ্যানের

নতুন গাছের দুটি ফল হ'য়ে বাগানের মালির সামনে পড়ল। মালি, নতুন গাছের ফল দেখে বড় রাজকুমারের নিকট নিয়ে গিয়ে বললে,—বড়কুমার, বাগানের নতুন গাছের নতুন ফল এই প্রথম পেলাম, আপনি খেয়ে তারিফ করবেন।

বড় রাজকুমার ফল দুটি হাতে ক'রে ভারি খুশি হ'য়ে দেখছেন, এমন সময় কিন্নররাজ এক সাধুর বেশ ধ'রে, বড় রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বললে,—রাজকুমার জয় হোক! ও ফল দুটি সাধু সেবায় দিন, মহা পুণ্য হবে! অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে!

ঠাকুর, এ নতুন গাছের নতুন ফল মালি আমায় খেতে দিয়েছে, এ ফল বাবাকে না দেখিয়ে কাকেও দেওয়া হবে না। এই বলে মালিকে অন্য ফল দিতে আদেশ করলে। মালি বড় রাজকুমারের আজ্ঞায় হরেক রকম সুস্বাদু ফল সাধুকে দিতে গেল। সাধুবেশধারী কিন্নররাজ তা গ্রহণ না ক'রে, ঐ ফল দুটি নেবার জন্যে মহা জিদ ধরলে, কিন্তু বড় রাজকুমারের দিতে মন সরল না।

সাধুকে বিমুখ হ'য়ে ফিরে যেতে দেখে, বড় রাজকুমার যেমন ফল দুটি সাধুকে দিতে হাত বাড়ালে, অমনি ফল দুটি সরষের আকার ধ'রে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। পড়বামাত্রই সাধু পায়রা হ'য়ে যেমন সরষে খুঁটে খেতে যাবে, অমনি কনিষ্ঠ রাজপুত্র মানুষ হয়ে তাকে ধ'রে খাঁচায় পুরে ফেললে।



এক ছুতোর, তারা তিন ভাই। দু-ভাই ছুতোরের কাজ করে, আর ছোট ভাই ছুতোরের কাজ জেনেও কিছু করে না, খায় দায় আর সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে ঘুরে বেড়ায়। ভায়েরা কাজের জন্যে কত সাধাসাধি করে, ছোট ভাই তা শোনে না, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

একদিন দু-ভায়ের অসহ্য বোধ হওয়ায় ছোট ভাইকে বললে,—দেখ্ হরিহর, কাজ না করলে খাবি কি? আমরা তোকে বসিয়ে বসিয়ে আর খাওয়াতে পারব না,—কাজ-কর্ম্ম করিস্ ত খেতে পাবি, নইলে বাড়ি থেকে দূর হ'য়ে যা!

হরিহর সোজা কথায় বললে,—আচ্ছা বেশ তাই হবে, আমাকে যন্ত্রপাতি দাও।

দু-ভাই যন্ত্রের বাক্স হরিহরের সামনে ধরে বললে,—কি নিবি নে।

হরিহর দরকার মত গুটিকত যন্ত্র নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

খানিকদূর যেতেই সে এক মাঠে এসে পড়ল। মাঝামাঝি এসে দেখলে এক বৃদ্ধ মাঠ দিয়ে চলেছে। হরিহর পথ হেঁটে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। বৃদ্ধকে দেখে বললে,—আপনার নাক কোথা মশাই ?

বৃদ্ধ খুব রেগে গিয়ে বললে,—তুমি অন্ধ ? দেখতে পাচ্ছ না ! এই মুখের ওপর এত বড় একটা নাক উঁচু হ'য়ে রয়েছে ! চোখের মাথা খেয়েছ না কি ! ব'লে কিনা নাক কোথা ? বেকুব কোথাকার !

বৃদ্ধ গাল মন্দ দিতে দিতে চলে গেল।

হরিহর একটা কথাও বললে না, একটু হেসে অন্য দিকে চলে গেল। খানিক দূর যেতে যেতে সে দেখলে এক কিশোরী কলসী কাঁকে ক'রে যাচ্ছে। হরিহর কিশোরীর সামনে গিয়ে বললে,—হাঁ গা তোমার নাক কোথা গা ?

মেয়েটি হরিহরের মুখের দিকে চেয়ে আঙল বাড়িয়ে বললে,—ঐ যে চালা ঘর দেখা যাচ্ছে ঐটে।

বটে ! তবে আমি গিয়ে বসতে পারি ?

নিশ্চয় ! সকলের বসবার জন্যই ত ঐ ঘর, বাড়ির বাইরে করা হয়েছে।

হরিহর আর কোন কথা না ক'য়ে পা চালিয়ে সেই ঘরে গিয়ে বসে পড়ল।

মেয়েটি জল নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতেই পিছু পিছু তার বাপ এসে উপস্থিত হ'ল। বললে,—বাবা ! একটি বিদেশীকে বৈঠক-

খানায় বসতে বলেছি, আপনি একবার দেখুন যাতে তিনি চলে না যান,—আমি কিছু জলখাবার তৈরী করি।

পিতা বৈঠকখানায় গিয়ে দেখে নাক কোথা জিজ্ঞাসা করাতে যে ছোকরাকে যা তা শুনিয়ে দিয়েছে সে-ই বৈঠকখানায় বসে আছে,—আর মেয়ে কিনা তার জলখাবারের বন্দোবস্ত করছে। এই সব দেখে বুড়ো ভারি চটে গেল, বাড়ির ভেতর ঢুকে মেয়েকে বললে,—সুদি, তুই কা'কে বাড়ি ঢুকিয়েছিস্?

কেন বাবা, আপনি ওকে চেনেন না কি?

চেনাচিনি কি আছে। সবাই কি সবাইকে চেনে, কথাবার্ত্তায় ধরা প'ড়ে যায়,—লোকটার মাথার ছিট্ আছে।

আপনাকে এমন কি কথা বলেছে যাতে পাগল বলে ঠাওরেছেন?

পাগল বলে পাগল! ছোকরা আমায় দেখে বলে কি না আপনার নাক কোথা?

আমি তেমনি দুশো কথা শুনিয়ে দিয়েছি। ছোকরার মুখে আর কথা নাই,—মুখের মতন উত্তর পেয়ে মুখ বুজে চলে গেল।

বাবা, উনি ঠিকই জিজ্ঞেস্ করেছেন। আপনি কথার অর্থটা বুঝতে না পেরে মিছিমিছি গালাগালি করেছেন।

কেন শুনি?

আমি দত্তদের পুকুর থেকে জল আনছিলাম, পথের মাঝে দেখি বিদেশী তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে আমাকেও ঐ কথা জিজ্ঞেস্ করেছিলেন,—তোমার নাক কোথা?

আমি তখুনি বুঝে নিয়ে বৈঠকখানা ঘর দেখিয়ে দিয়ে বসতে বললাম। বিদেশী লোককে ঘরে বসতে দিয়ে খাবার না খাইয়ে কি ছাড়া যায়।



আপনার নাক কোথা, মশাই ?

নাক মানে যে বৈঠকখানা ঘর, তা কি ক'রে বুঝলি মা ?

লোকে এই কথা ব'লে থাকে ব'লেই জানি।

তুই ঘরে বসে এত কথা কি ক'রে জানলি মা ? শুনলিই বা

কার কাছে ? ছোকরাটি বেশ ভদ্দর, আমি এত গালাগালি করলাম সে কিন্তু একটা কথাও বললে না, বেশ সরল মনে চলে গেল। দেখতে যেমন শিবতুল্য, মনটাও ঠিক শিবের মতন সাদা, দেখলে মায়া হয়।

তাছাড়া, আমার মনে হচ্ছে বাবা, ও জাতে ছুতোর।

কি ক'রে জানলি ?

ওঁর কাছে রেঁদা, বাটালি, করাত আরও কত কি যন্ত্র দেখে।

তা আছে বটে। ও যাই হোক না কেন, ওর খোঁজ খবরে তোর এত দরকার কি ?

এতে মেয়েটি লজ্জায় নত হ'ল। এতখানি আগ্রহ দেখান ঠিক হয় নি। মুখ নত ক'রেই বললে,—আমি ওঁকে বিয়ে করব।

কেমনতর মেয়ে তুই। ঘর, বাড়ি, জাত, কুল, কিছুই জানা নেই, শুনা নেই, অমনি চোখের দেখা দেখেই বিয়ে করতে মত করলি, এ কথা শুনলে লোকে বলবে কি ?

যে যাই বলুক বাবা, আমি ওকেই বিয়ে করব।

তোর ওপর ত কখন কথা কই নি,—বিয়ে করবি কর্, তবে জাত, কুল জানা ত দরকার।

তা জানবার দরকার নাই বাবা, আমি সবই জেনেছি, আমাদের স্বঘর, গৃহস্থ ভদ্রসন্তান। আমার কথা বিশ্বাস না হয় ওঁকে জিজ্ঞেস্ ক'রে দেখতে পারেন। এই জলখাবার নিয়ে যান,—জল খাইয়ে ঠাণ্ডা ক'রে পরে পরিচয় নেবেন।

পিতার হস্তে সুন্দরী, জল খাবারের থালাখানি দিলে।

বৃদ্ধ খাবারের থালা নিয়ে হরিহরের নিকটে গেল। তাকে যত্ন ক'রে জলখাবার খাওয়ালে। তারপর এটা ওটা কথার পর, তার পরিচয় নিয়ে জানলে, হরিহর তার স্বঘর জাতে ছুতোর।

হরিহরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে, বুড়ো এতদূর তুষ্ট হয়েছিল যে, হরিহর যখন বুড়োর কাছে বিদায় নিয়ে যেতে চাইলে, তখন বুড়োর দুচোখ জলে ভরে গেল, দুহাত ধরে বললে,—দেখ বাবা! তোমায় আমি ছাড়ছিনে, তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে ক'রে ঘর-কন্না কর,—দেখে সুখী হই।

হরিহর খানিক কি ভাবলে, পরে বললে,—আমায় মেয়ে দিয়ে কি লাভ হবে। আমি গতরে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে, খেটে-খুটে যে আপনার মেয়েকে খাওয়াব, তা আমি পারব না,—আমাকে জামাই ক'রে আপনার লাভ কি?

এমন যদি হয় তবে নাচার। আমার এমন অবস্থা নয় যে, মেয়ে জামাই দুজনকে পুষি। আমার যে দুই ছেলে আছে, তারাও কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে ব্যস্ত! কি করি তা ভেবে ঠিক করতে পারছি নি। তবে তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে মেয়ে আমার বড়ই সুখী হ'ত।

ভাবনার কথাই ত, কিন্তু কি করব বলুন। আমি ভেবে রেখেছি এ জীবনে বিয়ে করব না। আপনি আপনার মেয়েকে এই কথা বললেই সে বুঝে নেবে।

এই বলে সে অন্যমনস্ক হ'য়ে কি ভাবতে লাগল।

সুন্দরী, উভয়ের কথা-বার্ত্তা আড়ি পেতে শুনছিল। সে ঠিক

ভেবে নিয়েছিল যে, তার বাপ যেরূপ কুৎসিত, সে কুৎসিত লোকের মেয়ে কখনই সুন্দর হ'তে পারে না, তাই বিয়েতে বোধ হয় অমত করছেন। যদি সে যুবককে তার রূপের আভাষ দিতে পারে, তা' হলে যুবক যে বিয়েতে সম্মতি না দিয়ে থাকতে পারেন না এটা স্থির। আর যদি তিনি নাও কাজ কর্ম্ম করেন, আমার ত গতর আছে, আমি ধান ভেনে, চাল কেঁড়ে যা ক'রে হোক দুজনের পেট ভরাতে পারব।

তার পর সুন্দরী একটা মতলব ঠিক করে নিলে। বাড়ির পেছনের খিড়কির পুকুর থেকে একটা পদ্মফুল ছিঁড়ে নিয়ে এল। সেই পদ্ম-ফুলের ডাঁটা একটা পাঁশের হাঁড়িতে পুঁতে বাপকে বললে,—বাবা এই হাঁড়িটা অতিথিকে একবার দেখান ত।

বৃদ্ধ এ হেঁয়ালির অর্থ বুঝতে না পেরে, মেয়ের কথামত হরিহরের কাছে ঐ হাঁড়িটা নিয়ে গিয়ে বললে,—আমার মেয়ে সুন্দরী, তোমায় এইটি দিয়েছে। হরিহর ছাইয়ের হাঁড়িতে পদ্মফুল দেখে সুন্দরীর বুদ্ধির প্রশংসা করলে, বুঝলে সে সঙ্কেতে জানিয়েছে যে, ছায়ের গাদাতেও পদ্মফুল ফোটে, এতে বুড়োর মেয়ে যে খুব সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ নাই। ভেবে বললে,—আমি আপনার মেয়েকে এই সর্ত্তে বিয়ে করতে পারি যদি সে আমায় বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ায়।

বুড়ো গিয়ে মেয়েকে ঐ কথা ব'লে নিজের দুর্দ্দশার কথা ক'য়ে বললে,—দেখ্, একে ত আমাদের টানাটানির সংসার, এ অচল সংসারে খরচ বাড়লে কেমন করে চলবে মা, তুই বল্! এর ওপর দুটী কাচ্চা বাচ্চা হ'লে ত আর রক্ষা নাই! বিয়ে কি করে হয়!

সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না বাবা, পুরুষ মানুষ কখনই নিষ্কর্ম্মা থাকতে পারেন না। কিন্তু ভগবান যদি তাই করেন,



বাবা, এই হাঁড়িটা অতিথিকে একবার দেখান ত?

তখন আমি ধান ভেনে, চাল কেঁড়ে যা ক'রে হোক খেটে নিজেদের খাওয়া-পরা চালাব।

বেশ মা, তবে এ শুভ কাজে বিলম্বে কাজ কি, আজই যাতে বিয়েটা হ'য়ে যায় তার ঠিক ক'রে ফেলিগে।

বুড়ো, হরিহরের কাছে সব কথা জানালে এবং সেইদিনই শুভলগ্নে সকলের উপস্থিতিতে বুড়ো, সুন্দরী ও হরিহরের বিবাহ দিলে। সেই অবধি হরিহর বুড়োর বাড়িতে রয়ে গেল।

প্রথম প্রথম হরিহরের আদর-যত্ন দেখে কে? পরে যত দিন যেতে লাগল আদর-যত্ন এমন কি খাওয়া-পরা সম্বন্ধে নানা গোল হ'তে লাগল। হরিহর নীরবে সব সহ্য করলেও সম্বন্ধীরা নানা ছলে নানা টিট্‌কারি দিতে দিতে একদিন সত্য সত্যই ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে পৃথক করে দিলে। সেই অবধি সুন্দরী পাড়া প্রতিবেশীর ধান ভেনে, চাল কেঁড়ে, কষ্টে সৃষ্টে দিন কাটাতে লাগল। খেটে খেটে সুন্দরীর তেমন সুন্দর চেহারা কালীবর্ণ হ'য়ে গেল,—কেবল হাড় কখানা সার হ'ল, কিন্তু একদিনের জন্যও স্বামীকে সে দুঃখ জানায় নি, মনের দুঃখ মনেই চেপে স্বামীর সেবায় রত থাকত।

একদিন হরিহরের চোখ স্ত্রীর উপর পড়ল, চমকে উঠে বললে,—তুমি এত রোগা হ'য়ে যাচ্ছ কেন? খাটুনি বড্ড বেড়েছে তা আমি বুঝতে পারছি! কৈ একবারও ত' কিছু বলনি, বললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হত!

আমি ত বলেই বিয়ে করেছি যে, তুমি যদি কোন কাজকর্ম্ম না কর, বসে থাক, আমি তোমায় খেটে খাওয়াব, এর ওপর আর কোন কথা চলে কি?

আমিও তাই কোন কথা কই নি, দেখি কতদূরের জল কতদূরে মরে। এখন দেখছি সত্যই তোমার মনের বল অসীম,—যা কথা সেই কাজ। আমি তোমার দুঃখ আর দেখতে পারছি না, কালই ভগবানের নাম ক'রে কাজে বেরুব, ভগবান কি আমাদের দুমুঠো ভাতের সংস্থান করবেন না।

পরদিন বেলা অবসানে হরিহর কুড়ুল নিয়ে বনের ভেতর গাছ কাটতে চলল। সে যখন গভীর বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে, তখন দুই সম্বন্ধীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তারা নিজেদের গড়নমত কাট কেটে নিয়ে ঘরে ফিরছিল। হরিহর গরীব ব'লে সম্বন্ধীরা তাকে দেখেও দেখলে না, পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

হরিহর কোন ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বনের ভেতর চলল। বনের মাঝামাঝি গেছে, এমন সময়ে তার মনে হল, কে যেন ডাকছে। হরিহর থামল। চারিদিক চেয়ে দেখে, একটা পেঁচা এক চোখ বুজে তার দিকে চেয়ে আছে। পেঁচা বললে,—আমি তোমায় ডেকেছি,—মা লক্ষ্মী তোমার উপর সদয় হ'য়ে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্যে।

হরিহর খুসী হ'য়ে একটা খুব বড় গাছের কাছে গিয়ে বললে,—হে বৃক্ষ, আমায় এক হাত ডাল দাও। অমনি এক হাত একটি ডাল তার সামনে পড়ল।

ডালটি নিয়ে বাড়ি ফিরতেই সুন্দরী বললে,—কিছু উপায় হ'ল ?

হরিহর হেসে বললে,—উপায় না ক'রে কি ফিরেছি!—এই দেখ, ব'লে সেই এক হাত গাছের ডাল স্ত্রীর সামনে ধরলে।

এ দুঃসময়ে তামাসা করতে দেখে সুন্দরীর বড় রাগ হ'ল। রেগে বললে,—এই এক হাত গরু বাঁধা খোঁটা এনে বাহাদুরি জানাতে লজ্জা হচ্ছে না!

হরিহর পূর্ব্বের ন্যায় হেসে বললে,—আমার কথা ঠিক কিনা দেখে নিও! আজ ত মঙ্গলবার, আসিছে বৃহস্পতিবার এই ডালটার কথা মনে ক'রে দিও সে দিন যা হ'ক একটা কিছু করা যাবে।

সুন্দরী কিছু না ব'লে, মাঝের কটা দিন খেটে সেই পয়সায় দুজনে খেলে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই স্বামীকে বললে,—ওগো শুনছ, আজ বৃহস্পতিবার মনে থাকে যেন,—ডালটার কথা তোমায় মনে করে দিচ্ছি।

বেশ করেছ, মনে ক'রে দিয়ে বড় ভাল করলে। দেখ, আজ রাত্তিরে আমি ঘরের দাওয়ায় এই ডালটা নিয়ে কাজে বসব। তুমি ঘরে খিল দিয়ে শোবে, আর বেরুতে পারবে না, বেরুলে কিন্তু সব পণ্ড হ'য়ে যাবে,—বুঝলে!

সেই দিন রাত্তিরে দুজনে আহারাদি ক'রে নিলে। স্বামীর কথা মত সুন্দরী নিজের ঘরে খিল দিয়ে শুল, হরিহর দালানে গাছের ডাল ও যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে বসল। সমস্ত রাত কাজ ক'রে ভোর হ'তেই কাজ শেষ করে উঠে পড়ল।

সুন্দরী ঘুম ভেঙ্গে উঠে, খিল খুলে দেখে, একটি চমৎকার ৭।৮

ফুট শোবার পালঙ্ক তৈরী রয়েছে। দেখে অবাক হ'য়ে গিয়ে বললে,—এত বড় পালঙ্ক কোত্থেকে এল! কে করলে?



পেঁচা বললে—আমি তোমায় ডেকেছি……

হরিহর বললে,—আমি কাল রাতে নিজের হাতে তৈরী করেছি।

এত কাঠ কোথা পেলে?

কেন, ঐ যে এক হাত গাছের ডাল যা বন থেকে এনেছি, ঐ ডাল থেকেই এই পালঙ্কটা করেছি।

সুন্দরী আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে,—বল কি! এমন ত কখন শুনিনি! অবাক্ ক'রে তুললে যে!

অবাক্ হও, আর বিশ্বাস নাই কর, ঐ এক হাত ডাল থেকেই হ'য়েছে। এখন একে রাজার হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি ক'রে এস।

কে বিক্রী করতে যাবে?

কেন, তুমি!

আমি বৌ মানুষ, আমার কি যাওয়া ভাল দেখায়?

পাড়ায় পাড়ায় ধান ভেনে, চাল কেঁড়ে, আসতে পার! আর যত লজ্জা রাজার হাটে যেতে।

তুমি যাও না কেন?

আমি খেটে করেছি, এই তোমার ভাগ্যি। টাকার দরকার হয়, বিক্রি করতে নিয়ে যাবে, দরকার না হয় টান মেরে ফেলে দেবে!

আচ্ছা, না হয় আমিই যাব, দর দস্তুর কে করবে?

সে বিষয়ে চিন্তা নাই,—এই পালঙ্ককে দাম জিজ্ঞেস্ করলে, সে নিজেই দাম বলবে।

সুন্দরী কৌতূহলী হ'য়ে বললে,—আচ্ছা পালঙ্কমশাই, তোমার দাম কত?

পালঙ্ক বললে,—আমার দাম হাজার এক টাকা।

সুন্দরী, পালঙ্ককে উদ্দেশ ক'রে বললে,—কার দায় পড়েছে যে তোমায় এত দাম দিয়ে কিনবে?

কিনবে গো কিনবে, একবার হাটে নিয়ে গিয়ে দেখ না।

বটে পালঙ্ক মশাই, তবে চলুন রাজার হাটে যাই।

মুটে ডাকুন।

মুটে ডেকে সুন্দরীর সঙ্গে পালঙ্ককে রাজার হাটে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

বেলা পড়ে গেল, হেটো লোকগুলো যে যার সামগ্রী বিক্রি ক'রে চলে গেল,—খদ্দেরের অভাবে পালঙ্কখানা অবিক্রি রয়ে গেল।

লোকজনকে রাজা হুকুম দিয়ে রেখেছেন, হাটে কোন জিনিস বিক্রি না হ'লে রাজ সরকারে তা কিনে নেবে।

বেলা শেষে রাজসরকারের লোক হাটে এসে দেখলে, একখানা নতুন শোবার পালঙ্ক বিক্রি না হ'য়ে পড়ে আছে, আর একটি বৌ পালঙ্কের পাশে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে। রাজার লোক পালঙ্কের কাছে এসে বৌটিকে বললে,—মা, এ পালঙ্কের দাম কত?

পালঙ্ককে জিজ্ঞেস্ করুন।

এ রকম অদ্ভুত উত্তর শুনে লোকটি বললে,—মা, আমি তামাসা করতে আসিনি, সত্যিই এ পালঙ্কের দাম কত তাই জিজ্ঞেস্ করছি।

আমিও তামাসা ক'রে বলি নি, পালঙ্ককে দাম জিজ্ঞেস্ করলে, পালঙ্ক নিজেই তার উত্তর দেবে।

বটে! এ বড় আশ্চর্য্য কথা ত! এমন ত কখন দেখিনি!

শুনিনি! দেখি পালঙ্ক কি বলে? পালঙ্ক, তোমার দাম কত বল ত? আমি রাজার লোক, রাজার তরফ থেকে আমি জিজ্ঞেস্ করছি, ঠিক দাম বল?

তখন পালঙ্ক মানুষের মতন কথা ক'য়ে বললে,—রাজামশাইকে বলবেন, আমার আসল দাম হাজার এক টাকা, এর কমে চাইলে সেখানে যেতে আমি নারাজ।

হাজার এক টাকা দাম শুনে লোকটা ভাবলে, এত বেশি দাম যখন, তখন রাজাকে ব'লে, তাঁর অনুমতি নিয়ে কাজ করাই ভাল। এই ভেবে সে রাজার কাছে ছুটে গেল। রাজাকে গিয়ে বললে,—মহারাজ! হাটে সব জিনিস বিক্রি হ'য়ে গেছে, থাকবার মধ্যে একখানা অদ্ভুত শোবার পালঙ্ক বিক্রি না হ'য়ে পড়ে আছে। আশ্চর্য্যের কথা কি বলব মহারাজ! সে পালঙ্ক মানুষের মত কথা কয়। একটি বৌ সেই পালঙ্ক বিক্রির জন্যে এনেছে। বৌটিকে জিজ্ঞেস করলাম পালঙ্কের দাম কত? সে বললে,—এই পালঙ্ক নিজেই দাম বলবে।

আমি তাই করলাম। পালঙ্ক উত্তরে বললে,—আমার দাম হাজার এক টাকা। অত দাম দিয়ে কিনতে আমার সাহস হ'ল না, তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি, আপনি যা অনুমতি করবেন তাই হবে।

রাজা পালঙ্কের অদ্ভুত পরিচয় পেয়ে বললেন,—এমন ত কখন দেখিনি শুনিনি, যে শোবার পালঙ্ক কথা কয়। আচ্ছা আমি নিজেই যাচ্ছি,—পালঙ্ক কোথায় আছে আমায় নিয়ে চল।

লোকটি রাজাকে সঙ্গে ক'রে পালঙ্কের কাছে নিয়ে এল। রাজা দেখলেন হাট আলো ক'রে এক সুন্দর পালঙ্ক বিরাজ করছে। তার পাশে এক গৃহস্থ বৌ মাথায় ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা বৌটিকে দেখে অতি সম্ভ্রমে জিজ্ঞেস্ করলেন,—আচ্ছা মা, এমন সুন্দর পালঙ্ক কে তৈরী করেছে?

আমার স্বামী।

তোমরা কি জাত?

আমরা জাতিতে সূত্রধর।

তোমাদের বাড়ি কোথায়?

আপনার এই রাজত্বেই বাস করি। হলধর মিস্ত্রীর নাম বোধ হয় শুনে থাকবেন, আমি তাঁর কন্যা।

তুমি হলধর মিস্ত্রীর মেয়ে! ওঃ বুঝেছি! আর বলতে হবে না! এই পালঙ্কের দাম কত মা?

রাজাকে প্রণাম ক'রে বৌটি অতি সসম্ভ্রমে বললে,—মহারাজ, এই পালঙ্ক কথা কয়, একে দাম জিজ্ঞেস্ করলে উত্তর আপনিই সে দেবে।

যেন স্বপ্ন ব'লে রাজার মনে হ'ল। কাঠের পালঙ্ক কথা কয় এ কি সম্ভব! কর্ম্মচারীর মুখেও ঐ কথা, কিন্তু তিনি নিজে সত্যাসত্য কিছু প্রমাণ পান নাই। একবার পরীক্ষা করা উচিত, এই ভেবে বললেন,—পালঙ্ক, তোমার দাম কত?

মহারাজ, আপনাকে অধিক আর কি বলব, আমার দাম হাজার এক টাকা, এক পয়সা এদিক ওদিক নয়।

বেশ তাই, দাম কাকে দেব ?

পালঙ্কের মালিককে।

মালিকের ঠিকানা ?

আপনার এই লোক জানে। সেই সময়ে কর্ম্মচারী বলে উঠল,—হাঁ মহারাজ, আমি পূর্ব্বে বৌটির কাছ থেকে সব জেনে নিয়েছি।

তখন রাজা সুন্দরীকে লক্ষ্য করে বললেন,—মা, আমি এই পালঙ্ক নিয়ে চললাম, বাড়ি গিয়ে দাম পাঠিয়ে দেব।

পালঙ্কখানি রাজার বাড়িতে যাওয়ামাত্র, রাজার আদেশে হাজার এক টাকা হরিহরের নামে হলধর মিস্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে পৌছিল। সুন্দরীর আনন্দের আর সীমা নাই। এতদিনে তার ধান ভানা, চাল কাঁড়া ঘুচল। একটা আলাদা বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীতে পরম সুখে বাস করতে লাগল।

এদিকে রাজা সেই পালঙ্ক কিনে নিয়ে গিয়ে, প্রাসাদের এক কক্ষে রেখে শয্যাদি প্রস্তুত করিয়ে শোবার ব্যবস্থা করলেন।

প্রথম রাত্রে রাজা পালঙ্কে শয়ন করে আছেন,—নানা চিন্তা এসে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত করছে, এমন সময় পালঙ্কের এক দিককার পায়া কথা ক'য়ে অন্য তিন পায়াকে বললে,—কি গো তোমরা ঘুমচ্ছ না জেগে আছ ?

অপর তিন পায়া অমনি ব'লে উঠল,—কেন গো! কি দরকার তোমার ?

বলি কি, রাজা মশাই অন্দর মহল ছেড়ে এই পালঙ্কে

ঘুমুচ্ছেন, এই সুযোগে একবার অন্দর মহল তদারক ক'রে আসি। তোমরা এই কোণটা ধ'রে থেক, যেন ঝুলে প'ড়ে রাজার ঘুম না ভেঙে যায়



মহারাজ, এই পালঙ্ক কথা কয়·····

অপর তিন পায়া বললে,—বেশ, তুমি যাও, আমরা তোমার দিকটা ধ'রে থাকব।

পায়া খট্ খট্ শব্দ ক'রে চলে গেল। খানিক বাদে এসে হাজির হ'য়ে যেমন ছিল সেই রকম খট্ ক'রে খাটে জুড়ে গেল।

অন্য তিন পায়া তাকে জিজ্ঞেস্ করলে,—শুনছ ?

কি ?

এই গেলে ও এলে, কিছু বললে না ত ?

বলব কি,—বড় কুখবর বলবার যো নাই।

এই নিশুতি রাত্তিরে কে শুনতে আসবে। রাজা মশাই ত ঘুমে অচেতন, এ সময় না বললে আর সময় হবে কখন,—ব'লে ফেল।

তবে শোন বলি। আমি ত এ ঘর ছেড়ে অন্দরে গেলাম। সব ঘর ঘুরে দেখলাম, দাস-দাসী যে যেখানে সবাই ঘুমে ঘোর ; কিন্তু রাণীর ঘরে গিয়ে দেখলাম, রাণী রাজার বিরহে বিছানায় প'ড়ে ছট্‌ফট করছেন। আমি তাই দেখে রাণীকে মন্তরে অচেতন ক'রে দরজায় তালা দিয়ে এসেছি।

রাজা চুপটি ক'রে সব শুনছিলেন। মনে মনে বললেন,—যদি এ কথা সত্য হয়, তাহ'লে এ পালঙ্কের মিস্ত্রীকে হাজার এক টাকা দিয়ে পাঠাব।

দ্বিতীয় পায়া বললে,—ভাই-সব, আমি একবার রাজার কয়েদ-খানা দেখে আসি। তোমরা এই কোণটা তুলে ধর, যেন রাজার ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। ব'লে পায়াটা খটাস্ ক'রে পালঙ্ক ছেড়ে চলে গেল। খানিক বাদে এসে খটাস্ করে পালঙ্কে জোড়া লেগে গেল। অন্য পায়াগুলি বললে,—কি ভাই, কি দেখে এলে ?

পায়া বললে,—ভাগ্যি আমি গিয়ে পড়েছিলাম তাই রক্ষে, নইলে রাজার কয়েদখানা একেবারে শূন্য হ'য়ে যেত। কতকগুলো

বদ্‌মাস্ চোর ফিকির খাটিয়ে কয়েদ ঘরের তালা ভেঙে, পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাচ্ছেল, আমি সব চোরকে ধ'রে তাদের হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি দিয়ে একটা খালি ঘরে পূরে তালা বন্ধ ক'রে রেখে এসেছি।

রাজা মনে মনে বললেন,—যদি এ কথা সত্য হয়, এই ছুতোরকে হাজার এক টাকা দিয়ে পাঠাব।

তৃতীয় পায়া অন্য পায়াদের বললে,—ওগো তোমরা শোন। আমি একবার রাজার ধনাগার দেখবার জন্যে বাইরে যাব, তোমরা এই পালঙ্কের দিকটা তুলে ধর, যেন রাজামশায়ের ঘুম না ভাঙে। ব'লে খট্ ক'রে পায়াটা চলে গেল। খানিক পরে এসে পায়াটা পালঙ্কে জোড়া লেগে গেল।

পায়ারা সব বললে,—অত হাঁপাচ্চ কেন? কি এমন বীরের কাজ ক'রে এলে যাতে তুমি দম্ ফেলতে পারছ না।

হাঁপাব না, বল কি? প্রাণ নিয়ে যে পালিয়ে আসতে পেরেছি এই মহাভাগ্যি! আমি না গিয়ে পড়লে রাজার ধনাগারে আর কিছু থাকত না,—সব লুট হ'য়ে যেত। বলব কি একপাল চোর প্রহরীদের হাত পা বেঁধে রাজার ধনাগারে ঢুকে ধন-রত্ন যা ছিল সব বার ক'রে নিয়ে পালাচ্ছেল। আমি তাদের সবাইকে মেরে ফেলে ধন-রত্নগুলো একজায়গায় জড় ক'রে মাটি চাপা দিয়ে রেখে এসেছি। এ সবের খাটুনি বড় কম মনে কর না কি!—তাই এত হাঁপাচ্ছি বুঝলে?

রাজা শুনে শিউরে উঠলেন। মনে মনে ঠিক করলেন,—যদি

সত্যই এ রকম ঘটে থাকে, আমি এই পালঙ্কের মিস্ত্রীকে হাজার এক টাকা দিয়ে পাঠবই পাঠাব।

চতুর্থ পায়া অপর তিন পায়াকে ডেকে বললে,—দেখ ভাইসব, তোমরা তিনজনেই বাইরে বেরিয়ে যে সব কাণ্ড দেখলে, সে সব বড় সোজা নয়। এসব সামলাতে না পারলে রাজার যে কি ক্ষতি হ'ত তা বলবার নয়,—তাই আমারও একবার বাইরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তোমরা আমার দিকটা দেখ আমি চললাম। বলেই খট্ ক'রে পালঙ্ক ছেড়ে পালিয়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরে চুপে সাড়ে ঘরে এসে যেমন পালঙ্কের পায়া ছিল তাই হ'ল। অন্য পায়াগুলো তার রকম সকম দেখে বললে,—কি ভায়া এত চুপ্‌চাপ্ কেন, কিছু দাঁও মেরে এলে না কি?

দাঁও ব'লে দাঁও! এত ধন-দৌলত সন্ধান ক'রে এসেছি, যা সাত রাজার ধন একত্র করলেও ওর তুলনায় কিছুই নয়।

কোথায় হে?

এই রাজ উদ্যানের দক্ষিণে যে বড় নারকেলগাছটিতে একটা সাদা কাক বাসা করেছে, ঐ গাছটার গোড়ায় রাশি রাশি হীরে জহরৎ অনেক কাল ধ'রে পোঁতা আছে। এতকাল রাজামশাই যে সন্ধান করেন নি, এই বড় আশ্চর্য্য! বলব কি ভাই, এত ধন দৌলত দেখলে তোমরাও অবাক্ হয়ে যাবে।

এদের কথাও শেষ হল, আর সেই সঙ্গে রাজাও পিঠ মোড়া দিয়ে উঠে বসলেন, বললেন,—এখন রাত সাড়ে তিনটে, আর আধ ঘণ্টা

হ'লেই ভোর হবে, আর শোব না। এই কথা বলতে বলতে ঘরের বার হলেন, আর মনে মনে বললেন,—যদি কথাগুলো সত্য হয় তা'হলে ছুতোরকে এত টাকা দেব, যাতে সে ফেলে ছড়িয়ে খরচ করলেও ফুরুবে না।

রাজা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর, একটা পায়া হিহি ক'রে হেসে বলে উঠল,—দেখ্ ভাই, ভারি মজা হয়েছে ; রাজামশাই আমাদের সব কথা শুনেছেন।

অন্য পায়াগুলো অমনি আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বলে উঠল,—আমরা রাজাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথা কয়েছিলাম, রাজার তা কানে গেছে দেখে বড়ই আহ্লাদ হ'ল। রাজা লোকও ভাল, তা না হ'লে একটা কাঠের পালঙ্ককে দরদস্তুর না ক'রে এক কথায় হাজার এক টাকায় কিনে নেয়।

চতুর্থ পায়া বলে উঠল,—মিলেছে ভাল,—মিলেছে ভাল। হরিহর মিস্ত্রী যেমন চিরকাল সাধুর বাতাস পেয়ে উদাসীন ভাবে কাটিয়েছে আদবেই টাকার লোভ করেন নি, ভগবান তেমনি তাঁকে সংসারী ক'রে রাশি রাশি টাকা পাইয়ে দিচ্ছেন। এখন তাঁর অন্নপুর্ণা গৃহিণীও দু হাতে অকাতরে ধন বিতরণ ও দরিদ্রের দুঃখ মোচন ক'রে ধন্য হবেন।

রাজা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েই রাণীর ঘরে উপস্থিত হলেন। দেখলেন রাণীর জ্ঞান নাই, যেন নেশায় অচেতন। রাজা রাত্রির বৃত্তান্ত স্মরণ ক'রে নিশ্চিন্ত মনে রাণীকে সেই অবস্থায় রেখে, উদ্যানের

দিকে চললেন। গিয়ে দেখেন ধনাগার শূন্য। কিছুদূরে একটা পেঁকো পুষ্করিণীতে অনেকগুলো লোক মরে পড়ে আছে,—তার কাছেই একটা জায়গায় প্রভূত ধন-রত্ন মাটি চাপা মজুত রয়েছে। রাজা লোক দিয়ে সেই সব ধন-রত্ন ধনাগারে রক্ষা ক'রে প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখলেন, এক খুব বড় নারকেলগাছের মাথায় একটা সাদা কাক বাসা করেছে। সেই নারকেলগাছের গোড়া খুঁড়তেই প্রচুর ধনরাশি বেরিয়ে পড়ল, রাজা সেই সব ধন-রত্ন ধনাগারে তুলে রেখে তাঁর অঙ্গীকার মত হরিহর মিস্ত্রীকে চার হাজার চার টাকার সঙ্গে একগাড়ি টাকা পুরস্কার স্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন।







মহাভারতের কথা।

পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের কাছে হারিয়া গেলেন। বাজি হইয়াছিল যে, যদি যুধিষ্ঠির হারিয়া যায়, তাহা হইলে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীকে বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে।

বাধ্য হইয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদী রাজ্য-সুখ ছাড়িয়া বনে বাস করিতে গেলেন। কত দেশ দেশান্তরে, কত বন উপবনে, কত মুনি ঋষিদের তপোবনে তাঁহারা ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এমনি করিয়া একদা তাঁহারা কাম্যকবনে উপস্থিত হইলেন। একদিন উত্তর দিক হইতে বাতাসে উড়িয়া একটি পদ্ম দ্রৌপদীর সম্মুখে পড়িল। দ্রৌপদী পদ্মের সৌরভে মুগ্ধ হইলেন। এমন পদ্ম ত তিনি কখনও দেখেন নাই। কত বড় সে পদ্ম—হাজারটা তার পাপড়ি,

তাই তার নাম সহস্রদল পদ্ম। এ পদ্ম স্বর্গ ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না।

দ্রৌপদী ভীমসেনকে বলিলেন,—দেখ দেখ কি চমৎকার পদ্ম। দেখতেও যেমন সুন্দর, সৌরভও তেমনি মধুর। রংটি যেন প্রভাত রবির মত রাঙা। আমি এ ফুল ধর্ম্মরাজকে দিব,—আমাকে আরও যে ক'রে হোক আনিয়ে দাও।

ভীমসেন বলিলেন,—তথাস্তু।

গদা, তূণী প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ভীমসেন চলিলেন,—উত্তর দিকে এই পদ্ম আছে। সেই সহস্রদল পদ্ম তাঁহার চাই। বনের পর বন, পাহাড়ের পর পাহাড় পার হইয়া চলিলেন; বনের ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল,—কিন্তু ভীমের গদার সামান্য আঘাতেই কেহবা মরিল, কেহবা পলাইয়া বাঁচিল। এমনি করিয়া অনেক দূর হাঁটিয়া তিনি একটি বিশাল পর্ব্বতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই পর্ব্বতের নাম গন্ধমাদন।

ভীমসেন পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিলেন। পথের নানা বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া অবশেষে এক সরোবর তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই সরোবরের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কদলীবৃক্ষ বিস্তৃত রহিয়াছে। কোথাও কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ভীমসেন শঙ্খনাদে দশদিক কাঁপাইয়া তুলিলেন।

ঐ কদলী বনে মহাবীর হনুমান বাস করিতেন। তিনি ভীমের দাপট ও গর্জ্জন শুনিয়া বুঝিলেন যে, ইনি তাঁহার ভ্রাতা

ভিন্ন আর কেহ নহেন। ঐ বনে স্বর্গ গমনের এক অতি সঙ্কীর্ণ পথ ছিল।

পাছে ভীমসেন ঐ পথে গিয়া শাপগ্রস্ত বা শক্র কর্তৃক পরাজিত



দেখ দেখ, কি চমৎকার পদ্ম

হন, এই আশঙ্কায় ভ্রাতার মান, সম্ভ্রম রক্ষা করিবার মানসে হনুমান সেই স্বর্গদ্বারের পথ অবরোধ করিয়া কপটে নিদ্রা যাইলেন, এবং মধ্যে মধ্যে ভূমিতে সজোরে লাঙ্গুল আঘাত করিতে লাগিলেন।

ভীমসেন সেই শব্দ শুনিয়া, উহার কারণ জানিবার জন্য শব্দ লক্ষ্য

করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক হনুমান শুইয়া ঘুমাইতেছে। স্বর্গরাজ্যের পথ তাহারই পশ্চাতে। ভীম বজ্রস্বরে বলিলেন,—কে তুই! স্বর্গরাজ্যের পথ আগলে শুয়ে আছিস্! ভাল চাস্ ত পথ ছাড়্! নইলে এখনই তোর মুণ্ডপাত করব!

হনুমান একটুও ভয় না পাইয়া হাসিয়া বলিলেন,—আমি পীড়িত, রোগের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে পড়ে আছি, কে হে তুমি আমায় বিরক্ত করতে এসেছ?

ছোট মুখে বড় কথা শুনিয়া ভীমের ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, বলিলেন,—সামান্য হনুমানের স্পর্দ্ধা দেখ! উঠবি কি না বল্!

ভীম গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

ভীমের গর্জ্জনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া হনুমান, বলিলেন,—আপনি মানুষ, সুতরাং জ্ঞানবান্। অতএব দুর্ব্বলের প্রতি এমন কঠোর হওয়া কি উচিত? আমি অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, বানরকুলে আমার জন্ম। আমরা লোকালয় বা ধর্ম্ম-কর্ম্মের কিছুই ধার ধারি না; আর সর্ব্ব প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে মানুষ, সেই মানুষ কুলে আপনার জন্ম, আপনি আমাদিগের অপেক্ষা কত বড় তা বলবার নয়; অতএব আপনার মুখে রূঢ় বাক্য শোভা পায় না। বোধ হয় আপনি ধর্ম্মের ধার ধারেন না, ভদ্রলোকের সহিত কখন মেলা-মেশা করেন নি, তাই অভদ্র স্বভাব প্রাপ্ত হ'য়েছেন, আমায় পীড়িত দেখেও দয়া প্রকাশ না ক'রে অভদ্র ব্যবহার করছেন। আপনি কে? কেনই বা এই নির্জ্জন অরণ্যে এসেছেন? কোথায় গমন করবেন? এই



উদ্যানের পরেই যে পর্ব্বত দেখছেন, উহাতে সিদ্ধ পুরুষ ভিন্ন অন্য কেহ প্রবেশ করতে পারে না। যদি ভাল চান ত' ফিরে যান, ওর ভেতরে যাবার চেষ্টা ক'রবেন না। গেলেই মৃত্যু।

ক্ষুদ্র বানরের মুখে পণ্ডিতের মত কথা শুনিয়া ভীম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, বলিলেন,—তুমি কে? কি নিমিত্তই বা বানর শরীর ধারণ করেছ? আমি ক্ষত্রিয়, সোমবংশীয় পাণ্ডুর পুত্র। নাম ভীমসেন।

হনুমান ভীমের বাক্যে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—হে ভদ্র, পরিচয়ে বুঝ্‌ছি যে, আপনি ওপথে যাবার সম্পূর্ণ অযোগ্য, আমি পথ ছাড়ব না,—অকারণে কেন প্রাণ হারাবেন, ঘরে ফিরে যান।

ভীমসেন বলিলেন—আমি মরি বা বাঁচি সে কথায় তোমার কাজ নাই, তুমি পথ ছাড়্‌বে কিনা বল? যদি পথ না ছাড় তা'র প্রতিফল এখনই হাতে হাতে পাবে।

হনুমান বলিলেন,—আমি রোগের জ্বালায় মরছি,—নড়বার শক্তি নাই, আপনি আমায় ডিঙিয়ে যেতে পারেন।

ভীম বলিলেন,—কাকেও ডিঙিয়ে যেতে নাই। আমার ত তোমার মতন বানর স্বভাব নয় যে, ডিঙিয়ে যাব। যেমন ত্রেতাযুগে হনুমান সাগর লঙ্ঘন করেছিলেন। আমার যদি সে স্বভাব হ'ত তা'হলে এখনই তোমার কথার অপেক্ষায় থাকতাম না।

হনুমান বলিলেন,—ভাল কথা, সেই হনুমানের বিষয় কিছু জানেন না কি? যদি জানা থাকে আমায় বলুন, আমার শুনতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

ভীম বলিলেন,—সেই বানররাজ আমার ভ্রাতা। তাঁর অশেষ গুণ। তিনি যেমন বলবান, বুদ্ধিমান, তেমনি মহা ধার্ম্মিক। রামায়ণে তাঁর অশেষ গুণব্যাখ্যা আছে। তিনি রামভার্য্যা সীতার উদ্ধারের জন্য এক লম্ফে সাগর লঙ্ঘন করেছিলেন। আমি তাঁর ভাই। তবেই বুঝ আমার বল কত। যদি মঙ্গল চাও পথ ছাড়, নচেৎ মরবার জন্য প্রস্তুত হও।

হনুমান তাহাতে ভীত না হইয়া বলিলেন,—কথায় কাজ কি, আমার লেজটা সরিয়ে যান না কেন?

ভীম মনে মনে বিরক্ত হইলেন,—একটা বানরের আস্পর্দ্ধার কথা দেখ। এটাকে উচিত শিক্ষাই দেওয়া উচিত। লেজটা ধ'রে দু চার বার ঘুরপাক খাইয়ে এক আছাড় মারলেই সাবাড়।

এই ভাবিয়া হনুমানের লেজটা ধরিয়া তুলিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য ভীম কিছুতেই লেজ সরাইতে পারিলেন না। শেষে গায়ের সমস্ত জোর দিয়া দুই হাতে তুলিতে গলদঘর্ম্ম হইয়া গেলেন, তবু লেজটাকে কিছুমাত্র সরাইতে পারিলেন না।

ভীম লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—হে বানরশ্রেষ্ঠ আমার অপরাধ নেবেন না, আমি না জেনে অনেক দুর্ব্বাক্য বলেছি। আপনি কে? কি জন্যই বা বানররূপ ধারণ ক'রেছেন, যদি বলবার বাধা না থাকে আমায় বলুন, আমি শুনবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হ'য়েছি।

হনুমান বলিলেন,—আমি পবনদেবের পুত্র, আমার মায়ের নাম অঞ্জনা, আমার নাম হনুমান। সমগ্র বানরকুল পূর্ব্বে যে, সূর্য্যপুত্র

সুগ্রীব ও ইন্দ্রসুত বালীর উপাসনা করতেন তাঁদের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ঘটে। কোন কারণে সুগ্রীব স্বীয় ভ্রাতা বালীর নিকট অপমানিত হ'য়ে ঋষ্যমূক্ পর্ব্বতে আমার সহিত বহুদিন বাস করেছিলেন।



আমার লেজটা সরিয়ে যাও না কেন ?

সেই সময়ে ভগবান বিষ্ণু মনুষ্যরূপে রাজা দশরথের পুত্র রাম নামে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। রাম পিতার সত্যপালনের নিমিত্ত, স্ত্রী সীতাদেবী ও অনুজ লক্ষ্মণকে ল'য়ে দণ্ডকারণ্যে বাস করতেছিলেন। দুরাত্মা রাবণ, মারীচ-নিশাচরের দ্বারা রামকে বঞ্চনা ক'রে সীতাকে

.ণ করে। সীতা অপহৃতা হ'লে রাম ও লক্ষ্মণ সীতাকে অন্বেষণ করতে করতে শৈলশিখরে সুগ্রীবকে দেখতে পান। দৈবক্রমে রামের সহিত সুগ্রীবের বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। সেই হেতু রাম বালীকে বধ ক'রে সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষেক করেন। সুগ্রীব রাজ্যলাভ ক'রে সীতার অন্বেষণে বহুশত বানর চারিদিকে পাঠান। সেই সময় আমিও অনুচর সঙ্গে সীতার অন্বেষণে দক্ষিণদিকে গমন করি।

পথিমধ্যে পক্ষিবর সম্পাতির সহিত সাক্ষাৎ হ'লে, তিনি আমাকে রাবণ কর্ত্তৃক সীতা-হরণের কথা বলেন। এই কথা শুনে আমি সীতাকে উদ্ধারার্থ বিস্তীর্ণ সাগর উল্লঙ্ঘন করি ও রাক্ষসরাজ রাবণের রাজধানীতে উপনীত হই। তথায় সীতাকে দর্শন ও তাঁর পদধূলি মস্তকে লয়ে লঙ্কাপুরী দগ্ধ ক'রে, রামের নিকট উপস্থিত হ'য়েছিলাম।

পরমব্রহ্ম রাম আমার বাক্যে বিশ্বাসপূর্ব্বক সমুদ্রে সেতু বন্ধন ক'রে বহু সংখ্যক বানর সমাবৃত হ'য়ে লঙ্কায় গমন করেন; এবং রাক্ষসরাজ, রাবণের ভ্রাতা, পুত্র ও বন্ধুবান্ধব যে যেখানে ছিল সকলকে সংহার ক'রে স্বীয় ভক্ত পরম ধার্ম্মিক বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তৎপরে স্বীয় সহধর্ম্মিণী সীতাকে উদ্ধার ও স্বীয় পুরী অযোধ্যায় আগমন পূর্ব্বক সিংহাসনে আরূঢ় হন। অনন্তর আমি রামের নিকট এই বর প্রার্থনা করেছিলাম যে, হে প্রভু! এই সংসারে যতকাল আপনার নাম থাকবে, ততকাল আমি যেন জীবিত থাকি। রাজীবলোচন রাম "তথাস্তু" ব'লে অভিলষিত বর প্রদান করলেন। সীতাদেবীর প্রসাদে এই স্থানে আমার ইচ্ছানুসারে নানাবিধ দিব্য

ভোগ্যবস্তু উপস্থিত হয়। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র একাদশ সহস্র বর্ষ রাজ্য-পালন করেছিলেন। অদ্যাবধি এই স্থানে অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ ত্রৈলোক্যপতি শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র-গাথা গান ক'রে আমাকে



ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিবামাত্র·

আনন্দ দান করেন। হে পাণ্ডুনন্দন, এই পথ মনুষ্যের অগম্য। পাছে আপনি এই পথে গিয়ে অপমানিত ও পরাভূত হন, এই কারণে আমি আপনার পথরোধ করেছি। এই পথে স্বর্গে গমন করা যায়।

ইহাতে মনুষ্যের যাইবার অধিকার নাই। আপনি যাহার অন্বেষণে গমন করছেন, সেই সহস্রদল পদ্মের সরোবর এই স্থানেই আছে।

মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন, মহাবীর হনুমানের মুখে সীতাহরণের সংবাদ শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইলেন, বলিলেন,—মহাশয়, আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে, কি পর্য্যন্ত আনন্দলাভ করলাম তা বলবার নয়। এক্ষণে একটি বিষয় আমার জিজ্ঞাস্য আছে, অনুগ্রহ ক'রে বললে বড়ই কৃতার্থ হব। মহাসাগর উত্তীর্ণ হবার সময়ে আপনি যে বিরাট রূপ ধারণ করেছিলেন, সেই বিরাট রূপ আমি দর্শন করতে ইচ্ছা করি। হে বীর, সেই বিশাল কলেবর দেখবার জন্যে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়েছি, অতএব আপনি সেই বিরাট রূপ দেখিয়ে আমার উদ্বেগ দূর করুন।

হনুমান এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সহাস্যে বলিলেন,—এক্ষণে আমার পূর্ব্বকার রূপ দেখবার সুযোগ হবে না, কেননা, কাল মাহাত্ম্যে সবই বিপরীত ভাব ধারণ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আকার প্রকারেরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে, পূর্ব্বের ন্যায় বল ও বীর্য্য আর নাই। তাই বলি আমার পূর্ব্বেকার সেই বিরাট শরীর দর্শনের আশা ত্যাগ করুন।

ভীম বলিলেন,—হে কপিবর! এক্ষণে যুগ মাহাত্ম্যের বিষয় কিছু বর্ণনা করুন, আমার শুনবার বড় বাসনা হয়েছে।

হনুমান বলিলেন,—হে ভ্রাতঃ! সত্যযুগে লোকসকল সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তৎকালে সকলে নীরোগ, দীর্ঘজীবি ও স্বধর্ম্মপরায়ণ হ'য়ে জীবন যাপন করতেন—দুঃখের লেশমাত্র

ছিল না। সে সময়ে ধর্ম্ম চতুষ্পদ বিশিষ্ট ছিল। ত্রেতা যুগে ধর্ম্মের ক্ষয় হ'য়ে ত্রিপাদ বিশিষ্ট হ'য়েছে। দ্বাপরে দ্বিপদ ও কলিতে এক পাদ বিদ্যমান থাকায় ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ একরূপ বিলুপ্ত হ'য়েছে। যুগনাশে ধর্ম্মের নাশ হচ্ছে এবং ধর্ম্মের নাশে লোকসকল বিনষ্ট হচ্ছে। এইরূপে লোক বিনষ্ট হ'লে, তাঁদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-সমুদায়ও ক্ষয় পাচ্ছে। হে মধ্যম পাণ্ডব ভীম, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, যখন কাল-প্রভাবে আমার দেহ, মন, প্রাণ সবই পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে, তখন আমার পূর্ব্বেকার বিরাট মূর্ত্তি দেখবার বাসনা পরিত্যাগ ক'রে গৃহে প্রত্যাগমন কর।

ভীম বলিলেন,—মহাত্মন্! আমি আপনার পূর্ব্বরূপ অবলোকন না ক'রে কদাচ গমন করব না; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় আপনার প্রকৃত বিরাট আকৃতি দেখান এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

ভ্রাতা ভীমসেনের বিনয় বাক্যে হনুমান, ভীমের অভিলাষ পূর্ণ করিবার মানসে, সাগর লঙ্ঘন সময়ে যে বিরাট আকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন সেই বিরাট আকৃতি ধারণ করিলেন। সেই ক্ষুদ্র শরীর ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া পর্ব্বত প্রমাণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ, নয়নদ্বয় বিঘূর্ণিত, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ ও লাঙ্গুল চতুর্দ্দিকে কুণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত হইল।

মহাবল ভীম, হনুমানের পর্ব্বত প্রমাণ অতি ভীষণ শরীর সন্দর্শন করিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলে হনুমান বলিলেন,—ভ্রাতঃ! আমি ইচ্ছা করলে শরীর এতদূর বর্দ্ধিত করতে পারি

যে, তুমি পর্য্যন্ত ভয় পাবে, আর অন্যের ত কথাই নাই। এই বলিয়া শরীর অধিকতর বর্দ্ধিত করিলেন।

ভীমসেন হনুমানের অতি ভীষণ কলেবর দেখিয়া, ভয়বিহ্বল চিত্তে বলিলেন,—আর না! আর না! আর দেখতে পারছি না! দেহ ছোট করুন! সহজ রূপ ধরুন! আমার মনে হয়, রাম-রাবণের যুদ্ধে আপনি একাই রাবণকে সবংশে নিধন ক'রে সীতাদেবীকে উদ্ধার করতে পারতেন! কেন করেন নি এটাই আশ্চর্য্য!

হনুমান বলিলেন,—ভাই, তুমি ঠিকই বলেছ। রাবণকে আমি অতি সামান্যই জ্ঞান করতাম। মা জানকীকে কেন উদ্ধার করিনি জান? তাহ'লে রঘুকুলপতি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তি লোপ পেত। ত্রিভুবনবিজয়ী শ্রীরামচন্দ্র,—দশানন ও তাঁর অনুচরগণের প্রাণসংহার ক'রে মা জানকীর উদ্ধার সাধন করেছিলেন ব'লেই তাঁর যশোভাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে প'ড়েছে, নচেৎ হ'ত কি না সন্দেহ। তুমিও স্বীয় ভ্রাতা ধর্ম্মরাজের হিতাভিলাষী তা আমি জানি। এক্ষণে তুমি স্বকার্য্য সাধন উদ্দেশে গমন কর, তোমার কোনরূপ বিঘ্ন ঘটবে না। গমনকালে বায়ু তোমাকে রক্ষা করবেন। সৌগন্ধিক বনে গমন করবার এই একমাত্র পথ। এই পথে গমন করলে ধনপতি কুবেরের যক্ষ ও রাক্ষস রক্ষিত উদ্যান অবলোকন করবে।

এই বলিয়া হনুমান তাঁহার কলেবর সংযত করিলেন। এবং দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিবামাত্র তাঁহার

সমুদায় শ্রান্তি দূর হইল। তখন ভীম আপনাকে অদ্বিতীয় বলবান বলিয়া বোধ করিলেন।

অনন্তর কপিরাজ আনন্দভরে সৌহার্দ্দ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিলেন,—ভ্রাতঃ! আপন আবাসে গমন কর। প্রয়োজন হ'লে



আমি তাহা অবগত হ'য়েছি, অতএব

আমাকে স্মরণ ক'র, এবং আমি যে এস্থানে অবস্থান করছি তা কা'কেও প্রকাশ ক'র না। আমি তোমাদের পশ্চাতে রইলাম জানবে। হে মহাবাহো! যদি তোমার অভিলাষ হয়, তবে

অদ্যই আমি হস্তিনানগরে গিয়ে প্রস্তরাঘাতে সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রকে বিনষ্ট, নগর ধ্বংস এবং দুষ্ট দুর্য্যোধনকে বন্ধন ক'রে তোমায় সমর্পণ করি।

হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমসেন কহিলেন,—প্রভো! আপনার ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত বীরের সহায় সম্পন্ন লাভ ক'রে কি পর্য্যন্ত যে আনন্দ লাভ করলাম তা বলবার নয়। আমি আপনারই তেজোবলে সমুদায় শত্রুগণকে পরাজয় ও বশীভূত করব ইহা নিশ্চিত।

হনুমান কহিলেন,—হে ভ্রাতঃ! সত্য সত্যই আমি তোমার এই উপকার করব যে, যখন তুমি অরাতিগণের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সিংহনাদ করবে, তখন আমি তোমার সঙ্গে এমন প্রচণ্ড হুঙ্কার ছাড়ব যে, সেই হুঙ্কার শব্দে শত্রুদের গায়ের রক্ত শুকিয়ে গিয়ে সমরশায়ী হবে।

হনুমান এইরূপ ভীমের সহিত নানাবিধ কথোপকথন করিয়া ধনকুবের প্রতিষ্ঠিত সরসীর পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর ভীম ব্যাঘ্রগজাদিসেবিত অরণ্যমধ্যে পথ অতিক্রম করিয়া সরসীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। ঐ সরসী কৈলাসশিখরে কুবের ভবন ও গিরিনির্ঝরের পাদমূলে অবস্থিত থাকায় যারপর নাই মনোহারিণী হইয়াছে। সরসীতটে তরু ও লতারাজি বিপুল ছায়া বিস্তার পূর্ব্বক উহার সমধিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে। উহাতে নানাজাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

উহার সলিল নির্ম্মল, শীতল, লঘু ও অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু। সোপান শ্রেণী শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত, কর্দ্দম বিহীন, অবগাহনে ক্লেশ নাই।

ভীম ইচ্ছামত জলপান করিয়া সৌগন্ধিক বনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন ঐ সরোবর রাজরাজের ক্রীড়া-স্থান। দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, ঋষি, যক্ষ ও কিন্নরগণের পূজনীয়। ক্রোধবশনামক শতশত রাক্ষস উহার রক্ষক। ভীম মুনিবেশে খড়্গাদি বীর-পরিচ্ছদে নির্ভয়ে গমন করাতে, প্রহরী রাক্ষসগণ ভীমের বিরুদ্ধবেশ অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল,—এই পুরুষবর মুনিবেশে যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করিয়া এস্থানে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছে, জিজ্ঞাসা করা উচিত।

ইহার পর তাহারা ভীমের সমীপে গমন করিয়া দর্পভরে জিজ্ঞাসা করিল,—হে পুরুষ! তুমি কে? তোমার মুনিবেশ ও বীরবেশ দুই বেশই দেখছি, অতএব তুমি কি নিমিত্ত এস্থানে আগমন করেছ বল?

ভীম কহিলেন,—হে রাক্ষসগণ! আমি মহারাজ পাণ্ডুর নন্দন, যুধিষ্ঠিরের অনুজ, আমার নাম ভীমসেন। আমি ভ্রাতৃগণের সহিত বদরীতীর্থে আগমন করেছি। একদা প্রিয়তমা পাঞ্চালী আশ্রমে একটি সৌগন্ধিক পুষ্প অবলোকন করেন। বোধ হয় ঐ পুষ্পটি এইস্থান থেকেই বায়ুবেগে তথায় নীত হ'য়েছে। পাঞ্চালী তদবধি ঐ পুষ্প অধিক পরিমাণে পাবার জন্য উৎসুক হ'য়েছেন। আমি তাঁহার প্রিয়কারী। এক্ষণে তাঁহার অভিলষিত পুষ্প চয়ন মানসে এইস্থানে আগমন করেছি।

রাক্ষসগণ কহিল,—হে ভীমসেন, এই সরোবর যক্ষরাজের অতি

প্রিয়তম ক্রীড়াস্থান। দেহীর এস্থানে প্রবেশ করবার অধিকার নাই। এমন কি দেব, ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরগণ যক্ষরাজের বিনানুমতিতে জলপান বা বিচরণ করেন না। তুমি যদি ধনকুবেরকে অনাদর ক'রে বলপূর্ব্বক সৌগন্ধিক হরণ করতে উৎসুক হও, তা'হলে তুমি কদাচ ভদ্রলোক ব'লে বিবেচিত হবে না। তাই বলি হে বৃকোদর, তুমি যক্ষরাজের নিকট হ'তে অনুমতি নিয়ে এস এবং ইহার জলপান ও পদ্ম আহরণ কর ; নতুবা উহার প্রতি নেত্রপাত ক'র না।

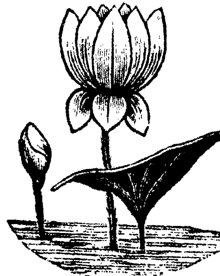
ভীম কহিলেন,—হে রাক্ষসগণ এস্থানে ধনেশ্বর কুবেরকে অবলোকন করছি না, অতএব কাহাকে আমন্ত্রণ করব ? আর যদিও সাক্ষাৎ পাই, তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে পারব না। কারণ ভূপালগণের ঈদৃশ সনাতন ধর্ম্ম প্রচলিত আছে যে, তাঁরা কুত্রাপি যাচ্ঞা করেন না। আমি কোন প্রকারে ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করতে অভিলাষী নহি। বিশেষতঃ এই সরোবর মহাত্মা কুবেরের ভবনে উৎপন্ন হয় নাই, ইহা পর্ব্বত নির্ঝরে জন্মেছে। অতএব ইহাতে কুবেরের যেরূপ, সকল লোকেরই সেরূপ অধিকার আছে। এবংবিধ স্থলে কোন্ ব্যক্তি কা'র নিকটে যাচ্ঞা ক'রে থাকে ?

মহাবল ভীমসেন রাক্ষসগণকে এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্ব্বক সরোবরে অবগাহন করিলেন। রাক্ষসগণ বারংবার নিষেধ করিলেও ভীম তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অনন্তর রাক্ষসগণ ভীমবিক্রমে ভীমসেনকে অস্ত্রশস্ত্র সহকারে যেমন আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, অমনি ভীম প্রচণ্ড গদা উত্তোলন করিয়া তাহাদের অভিমুখে ধাবমান

হইলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিল। পবননন্দন ভীম অবলীলাক্রমে রাক্ষসগণের শরজাল সংহার পূর্ব্বক সেই পুষ্করিণী সমীপে তাহাদিগের শত শত যোদ্ধাকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিলেন; যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও বিচেতন প্রায় হইয়া শূন্যপথে কৈলাসশৃঙ্গে পলায়ন করিল। অতঃপর ভীমসেন বিনা বাধায় সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে পুষ্প সঞ্চয় করিতে লাগিলেন; এবং তাহার অমৃতসম সলিল পান করিয়া তেজস্বী হইয়া উঠিলেন।

এদিকে ভীমবলতাড়িত রাক্ষসগণ সভয়চিত্তে ধনেশ্বর কুবেরের সমীপে আগমন পূর্ব্বক ভীমসেনের অমিত পরাক্রমের কথা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। কুবেরদেব তাহা শ্রবণান্তর সহাস্যবদনে বলিলেন,—হে রক্ষিগণ, ভীমসেন পাঞ্চালকুমারীর নিমিত্ত কমল চয়ন করছেন, আমি তাহা অবগত হয়েছি, অতএব তিনি স্বচ্ছন্দে সৌগন্ধিক গ্রহণ করুন।

বিজয়ী ভীম পুনরায় ভ্রাতৃগণসহ মিলিত হইলেন।





রাজকন্যার দুলো বর



এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী। বড় গরীব। ব্রাহ্মণ যা উপায় করে তা'তে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও একমাত্র কন্যা এই তিনটি প্রাণীর পেট ভরে না। ব্রাহ্মণী প্রত্যহ নানা গঞ্জনা দেয়।

ব্রাহ্মণ বলে,—দেখ ব্রাহ্মণী, ভাগ্যে না থাকলে হয় না। আমার এখন ভাগ্য মন্দ তাই কিছু হচ্ছে না, যখন কপাল ফিরবে, তখন ধন-কড়ি আপনি এসে পড়বে।

ব্রাহ্মণী বলে,—তুমি কি একবারও তোমার ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে দেখেছ? বোধ হয় দেখনি, দেখলে নিশ্চয় তার ফল পেতে। ঐ যে ও পাড়ার গুড়গুড়ে ভট্‌চায্যি কি বা লেখা পড়া জানে, কেমন রোজগার করছে। পরিবারের গায়ে গয়না দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়; আর তুমি লেখা-পড়া শিখে এক পয়সা আনতে পার না। আমাদের দেশের রাজা কত লোককে, কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কত কি দিচ্ছে, তুমি কি একবার রাজার কাছে গেছ, না কখন তাঁর নাম করেছ!

রাজার কাছে কেন যাইনি ব্রাহ্মণী তা শুনবে? রাজার কাছে যাওয়া অমনি নয়; সেই রকম সাজ-গোছ ক'রে তবে যেতে হয়, তা'তে পয়সা খরচ আছে! আমার কি সে পয়সা আছে যে, হুট্ ক'রে যা-তা প'রে রাজার কাছে যাব,—তুমিই বল?

এই কথা! তা বললেই ত হ'ত। আমি চেয়ে-চিন্তে এনে দিতাম। আচ্ছা আমি কালই রায়েদের বড় গিন্নির কাছ থেকে কাপড়-চোপড় যা কিছু সব নিয়ে আসব,—তুমি যেতে রাজি ত?

রাজি ত। তবে রাজার কাছে গিয়ে কি ব'লে দাঁড়াব।

সে কথাও তোমায় ব'লে দিতে হবে। মেয়েটা বড় হ'য়েছে, বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে, গলায় জল গলে না, তার বিয়ের টাকা চাই, এ কথা আবার ব'লে দিতে হবে।

পরদিন ব্রাহ্মণ সাজ-গোজ করলে, রাজ সভায় গেল, "মহারাজার জয় হোক্"! ব'লে সামনে দাঁড়াল। রাজা, ব্রাহ্মণকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে কাছে বসিয়ে, আগমনের কারণ জিজ্ঞেস্ করলেন।

ব্রাহ্মণ উত্তরে নিজের দুর্দ্দশার কথা, তার কন্যাদায়ের কথা পেড়ে অনেক দুঃখ করতে লাগল। ব্রাহ্মণের দুর্দ্দশা দেখে, রাজা ধনাধ্যক্ষকে ডেকে এক থলে মোহর দিতে আজ্ঞা দিলেন। ব্রাহ্মণ রাজাকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ ক'রে থলেটা মাথায় ক'রে বাড়িতে ফিরল।

ব্রাহ্মণ হাসিমুখে বাড়িতে ঢুকতেই ব্রাহ্মণী বললে,—ও থলেতে কি?

মোহর।

কোথা পেলে ?

রাজা মশাই দিয়েছেন।

কেন ?

মেয়ের বিয়েতে খরচ করতে।

ভাগ্যিস্ আমার কথা শুনলে, তাই এক থলে মোহর পেলে। এখন এক কাজ কর, সেকরাকে ডাক, আগে আমার গা-ভরা গয়না হোক্, তারপর তোমার মেয়ের বিয়েতে খরচ ক'র।

ব্রাহ্মণ চটে খুন, বললে,—আব্দার দেখে আর বাঁচিনে। কোথায় মেয়ের বিয়ের নাম ক'রে মোহর নিয়ে এলাম, সে মোহরে তুমি কি ব'লে ভাগ বসাতে চাও ? তা আমি কখনও দোব না।

ব্রাহ্মণীর রাগ চরম সীমায় উঠল,—রেগে বললে,—তোমার ন্যাকাপনা কথা আমি শুনতে চাইনে,—আগে আমার গয়না চাই! জান না! আমার জন্যই এত সোণা পেলে! এখন আমাকেই ফাঁকি! তাহ'লে কখনই মেয়ের বিয়ে দিতে দোব না!—আর তুমিই বা কেমন ক'রে মেয়ের বিয়ে দাও, তা দেখে নোব!

ব্রাহ্মণ আরও চটে গেল, বললে,—আমারও এক কথা,—মেয়ের বিয়ে না দিয়ে তোমার একখানাও গয়না হবে না, তা'তে তুমি যা পার ক'র!

বেশ, তুমি মেয়ে নিয়ে থাক! আমি খাব না—দাব না কিচ্ছু

করব না, এই চল্লাম! ব'লে ব্রাহ্মণী ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে রইল, আর ব্রাহ্মণ থলে আগলে বসে রইল।

বেলা শেষে ব্রাহ্মণের রাগ প'ড়ে গেল সে দেখলে, ব্রাহ্মণী হ'তেই মোহরের থলে পেয়েছে। সে বড় কম নয়। ব্রাহ্মণীর গয়না ও মেয়ের বিয়ে ঘটা করে দিয়েও সাত পুরুষ বসে খেলেও ফুরুবে না। তখন ব্রাহ্মণীকে চটিয়ে কাজ কি, ওর গয়নাগুলো আগেই হোক্ না কেন? এই ভেবে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকতে স্নুরু করলে,—ওঠ ব্রাহ্মণী ওঠ! তোমারই জিৎ, তোমারই গয়না আগে হবে।



ব্রাহ্মণী অভিমান ক'রে বললে,—আমি অমন গয়না চাইনে!

রাগ কর কেন ব্রাহ্মণী! তোমার বুদ্ধিতে যখন মোহর পেয়েছি, তখন তোমার ইচ্ছা আগে পূরণ করা দরকার। অভিমান ছাড়, রান্না-বান্না কর, খাওয়া-দাওয়া সেরে সেকরা ডেকে গয়নার ফর্দ্দ করা যাবে।

ব্রাহ্মণী হাসিমুখে রান্না করলে। পরে খাওয়া শেষ ক'রে দেখে মোহরের থলে নাই, কোথায় উধাও হ'য়ে গেছে।

তাইত, থলে গেল কোথা! ব'লে দুজনে চারদিক খুঁজতে লাগল, কিন্তু কোথাও থলে পাওয়া গেল না।

ব্রাহ্মণী বললে,—চোরে নিয়ে গেছে।

ব্রাহ্মণ বললে,—আমি ত থলে আগলে বসেছিলাম, চোর কখন এল, থলে আপনা হ'তেই উধাও হ'য়ে গেছে।

ব্রাহ্মণী বললে—তাই হবে। কপাল মন্দ হ'লে পোড়া শোল মাছটাও পালিয়ে যায়।

তাই ত ব্রাহ্মণী! এখন আমাদের দুঃখ ঘুচবার উপায় কি? চিরদিন কি এই রকম দুঃখে দুঃখেই কাটবে!

দেখ,—এক কাজ কর। যখন আমাদের ভাগ্য ভাল নয়, তখন যাতে আমাদের ভাগ্য ফিরে আসে, তাই কর।

ভাগ্য ফিরিয়ে আনতে পারলে ত ভালই হয়,—আনব কি ক'রে, কোথা গেলে ভাগ্য পাব, কে দেবে।

কেন, রাজার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসবে। রাজা যখন যাচকের ইচ্ছা পূরণ না ক'রে জল গ্রহণ করেন না, তখন রাজার কাছ থেকে তাঁর ভাগ্য চেয়ে নিলেই হবে।

ব্রাহ্মণীর কথাটা ব্রাহ্মণের কানে সুধা বর্ষণ করলে, বললে,—বলিহারি যাই ব্রাহ্মণী! বড় তাক্ বুঝে কথাটা বলেছ! আচ্ছা কালই রাজার কাছে গিয়ে একটা হেস্ত নেস্ত ক'রে আসব।

পরদিন যথাসময়ে ব্রাহ্মণ সেজে গুজে রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল, দু হাত বিস্তার ক'রে বললে,—"জয় হোক্ মহারাজ!"

রাজা মহাখুশি হ'য়ে ব্রাহ্মণকে কাছে বসিয়ে শারীরিক কুশল ও সাংসারিক নানা কথা জিজ্ঞেস্ করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ মোহর মোহর ব'লে কেঁদেই আকুল।

রাজা অনুমানে বুঝে নিলেন, তিনি যে মোহর ব্রাহ্মণকে দান করেছেন, সেই মোহর সম্বন্ধে কিছু হবে, বললেন,—মোহর মোহর কি বলছেন? অশ্রু মুছে অতি কষ্টে ব্রাহ্মণ বললে,—হাঁ মহারাজ! সব মোহর খোয়া গেছে দুর্ভাগার সুখ কোথায়? আপনার মত ভাগ্যবান আর কে আছে? আপনি যদি ঐ ভাগ্য আমাদের দান করেন, তবেই সুখ হবে, নচেৎ এ পোড়া অদেষ্টে সুখ হবে না। ব'লে ব্রাহ্মণ আবার হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগল।

রাজা বললেন,—ব্রাহ্মণ! যদি আমার ভাগ্য নিয়ে আপনি সুখী হন, আজ অবধি আমার সকল সৌভাগ্য আপনাকে দান করলাম,—আপনি সৌভাগ্যশালী হ'ন, ভগবানের নিকট আমার এই প্রার্থনা।

ব্রাহ্মণ রাজার নিকট হ'তে ভাগ্য আদায় ক'রে ঘরে ফিরলে। পথে দেখে একটি ৮।৯ বছরের মেয়ে তার পিছু পিছু আসছে। মেয়েটিকে দেখলে মনে হয় যেন স্বয়ং কমলা। প্রথমে ব্রাহ্মণ কিছু বুঝতে পারেনি, কে আসছে ত কে আসছে। শেষে বাড়িতে ঢোকবার সময় যখন দেখলে মেয়েটিও তার সঙ্গে বাড়িতে ঢুকছে, তখন

ব্রাহ্মণ বড়ই মুস্কিলে পড়ল, ভাবলে,—আমাদের দশা ত এই, আমাদেরই খেতে কুলোয় না, তার ওপর এ মেয়েটিকে যদি পুষতে হয়, ত্বঃখের অন্ত থাকবে না,—কাজ নেই বাড়িতে ঢুকিয়ে, এই বেলা তাড়িয়ে দেওয়াই ভাল। এই ভেবে ব্রাহ্মণ মেয়েটিকে বললে,— দেখ মা, আমাদের বড় কষ্ট এ বাড়িতে তোমার স্থান হবে না, অন্যত্র চেষ্টা দেখ।

মেয়েটি তবু সরলে না, ব্রাহ্মণের কথা কানেই তুললে না, স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। ব্রাহ্মণী পূর্ব্বেই একটা পিঁড়িতে আলপনা দিয়ে রেখেছিল, সেই পিঁড়িখানা নিয়ে এসে তার ওপর মেয়েটিকে অতি যত্নে বসিয়ে কিছু খাবার খাইয়ে দিলে। মেয়েটি খাবার খেয়ে "এই আসি" ব'লে অদৃশ্য হ'ল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী এই অবাক্ কাণ্ড দেখে, কমলার উদ্দেশ্যে শতকোটী প্রণাম করলে।

সেই দিন হ'তে ব্রাহ্মণের উন্নতি দেখা দিল। চারিদিক হ'তে সিধেটা-আসটা, টাকা-কড়ি আসতে লাগল, দেখতে দেখতে ব্রাহ্মণ মহাধনী হ'য়ে উঠল। বড় বাড়ি, বড় জুড়ি, বড় লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'য়ে দেশের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি হ'য়ে উঠল। এখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে বড় বড় ঘর থেকে মেয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল। ব্রাহ্মণ দেখে শুনে এক বড় ঘরে মেয়েকে পাত্রস্থ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'ল।

একদিকে যেমন ব্রাহ্মণের দিন দিন উন্নতি, দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হ'তে লাগল, অপর দিকে তেমনি রাজার দিন দিন অধোগতি ও

রাজ্যের মধ্যে তুর্লক্ষণ দেখা দিল। আজ এ মুলুক লাটে চড়ল, কাল ও মুলুক লাটে চড়ল, এই রকমে একে একে সব লোপ পেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে রাজা ব'লে পরিচয় দেবার আর কিছুই রইল না। রাজা এই সব দেখে শুনে পাগলের মত হ'য়ে গেলেন, রাজ্য ছেড়ে দীন তুঃখীর বেশে ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগলেন।

একদিন রাজা অপর এক রাজার দেশে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে এক ভগ্ন কালী মন্দিরের চত্বরে চিন্তায় মগ্ন, এমন সময় একদল দস্যু মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলে। দস্যু-সর্দ্দার নতজানু হ'য়ে প্রতিমার উদ্দেশে করযোড়ে বললে,—রক্ষা কর মা, রক্ষা কর! যেন লুঠ-তরাজে আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধি হয়! যদি তেমন কিছু করতে পারি তোমায় ঘটা ক'রে পূজো দোব, এই ব'লে সর্দ্দার,—"জয় মা কালী! জয় মা কালী!" বলতে বলতে দলবল নিয়ে প্রস্থান করলে।

ডাকাতেরা বনভূমি পার হ'য়ে সেই দেশের রাজার বাড়িতে লুট-পাট করতে ঢুকল। রাজার লোকবল বেশি থাকায় তেমন সুবিধে করতে পারলে না,—রাজার এক কচি ছেলের গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়ে রণে ভঙ্গ দিল। রাজার লোকজন মার্ মার্ শব্দে ডাকাতদের পিছু নিলে। ডাকাতের দল যে যেদিকে পারলে পালাল। সর্দ্দার দৌড়ে মন্দিরে ঢুকে কালী ঠাকুরের পায়ের তলায় হারছড়াটা ফেলে দিয়ে চম্পট দিলে।

রাজার লোকেরা ডাকাতদের পেছনে পেছনে ছুটে মন্দির পর্য্যন্ত এসে দেখে, একটা ডাকাত মন্দিরে ঢুকেই বেরিয়ে গেল। মন্দিরের মধ্যে রাজকুমারের গলার হারছড়া পেয়ে ডাকাতের কেউ না কেউ নিকটে আছে জেনে চারদিক খুঁজতে লাগল। মন্দিরের চত্বরে ভাগ্যহীন রাজা ছিলেন, তাঁকেই দস্যু মনে ক'রে রাজার কাছে বেঁধে নিয়ে গেল, বললে,—মহারাজ! এই দেখুন রাজকুমারের গলার হার,—সব ডাকাত পালিয়েছে, এটাকে অনেক কষ্টে ধরে এনেছি।

রাজা কিছু খোঁজ খবর না করেই হুকুম দিলেন,—ওটার হাত-পা কেটে সদর রাস্তায় ফেলে দাও।

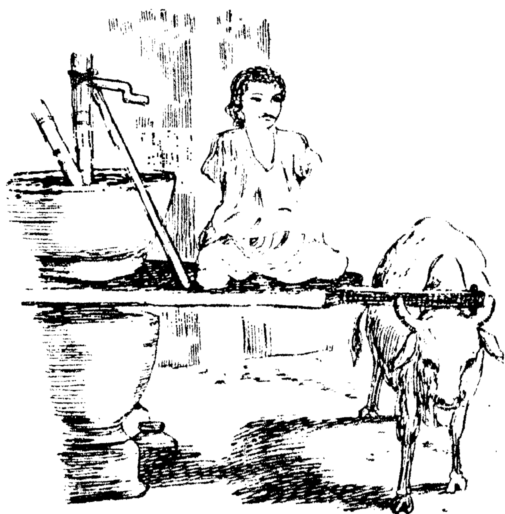
রাজার আদেশে ভাগ্যহীন রাজার হাত-পা কেটে সদর রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হ'ল।

দৈবক্রমে এক ধনী ব্যবসায়ী, শকটারোহণে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দিব্যকান্তি এক পুরুষকে হাত-পা কাটা অবস্থায় দেখে দয়াপরবশ হ'য়ে বাড়িতে নিয়ে গেলেন,—চিকিৎসা ক'রে তাঁকে বাঁচালেন।

ধনীর অনেকগুলি তেলের ঘানি ছিল। তিনি মতলব করলেন, এই হাত-পা-কাটা মানুষটাকে যদি একটা ঘানির তক্তে বেঁধে রাখেন তাহ'লে অনেক কাজ পাবেন। লোকটার হাত-পা নাই বটে, কিন্তু মুখ ত আছে,—যে গরুটা ঘানি টানতে টানতে দাঁড়িয়ে থাকবে, বা ফাঁকি দেবে, তা'কে ধমক দিলেই সে সাবধান হবে, কাজেই অনেক

তেল উৎপন্ন হ'তে থাকবে। আর তিনিও সেই অবসরে অন্য চেষ্টা ক'রে ব্যবসার উন্নতি করতে থাকবেন।

এই স্থির ক'রে ধনী ভাগ্যহীন রাজাকে একটা ঘানির তক্তে বেঁধে দিলেন। রাজা সেই তক্তে বসে গরুদের ধমক দিয়ে বেশ কাজ আদায় করতে লাগলেন।



ভাগ্যহীন রাজাকে একটি ঘানির তক্তে বেঁধে দিলেন।

দুর্ভাগা রাজার হাত-পা কেটেছিলেন যে রাজা, সেই রাজার তিন মেয়ে। একদিন তিনি বড় মেয়েকে নিকটে ডেকে আদর ক'রে বললেন,—মা বলত, তুমি কার ভাগ্যে খাও?

বড় মেয়ে বললে,—বাবা, একথা কি আবার জিজ্ঞেস্ করতে হয়। আমাকে খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টা করলেন আমি আপনার ভাগ্যেই খাচ্ছি,—আপনি না থাকলে আমার দুর্দ্দশার শেষ থাকত না।

রাজা মেজ মেয়েকেও ঐ কথা জিজ্ঞেস্ করলেন। মেজ মেয়ে বড় বোনের মত বাপের দোহাই দিলে।

ছোট মেয়েকে ঐ কথা জিজ্ঞেস্ করায় সে বললে,—বাবা, আমি অন্য কারও ভাগ্যে খাই না, আমি নিজের ভাগ্যে খাই।

রাজা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বললেন,—মা, তোর একথা বলা কি ঠিক হ'ল? তোর বোনেরা সবাই আমার দোহাই দিলে, আর তুই মা তাদের ঠিক উল্টো বল্‌ছিস্, এটা কি ঠিক হচ্ছে মা? বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে বল্?

না বাবা, আমি বেশ ক'রে ভেবেই বলছি। আমি কেন বাবা, সবাই নিজের নিজের ভাগ্যে খায়, আমিও তেমনি নিজের ভাগ্যে খাই-পরি।

রাজা মহা চটে উঠে বললেন,—দেখ্, এই শেষবার তোকে বলছি! যদি তুই ও কথা না ছাড়িস্, তোর এমন দুর্দ্দশা করব যা দেখে শেয়াল কুকুরও কাঁদবে!

আপনি যাই শাস্তি দিন বাবা! আমি এখনও বলছি, আমার ভাগ্যে যদি সুখ থাকে, সে সুখ কেউ ঘোচাতে পারবে না।

রাজা আর কোন কথা না ব'লে রাগে গস্ গস্ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, মন্ত্রীকে ডেকে বললেন,—দেখ মন্ত্রী, আমার ছোট মেয়েটার বড়ই বাড় বেড়েছে, আমাকে আর মানতে চায় না। বলে কিনা, সে তার নিজের ভাগ্যে খায়—আমি ওকে দেখে নোব কেমন সে নিজের ভাগ্যে খায়। আমি মেয়েটার এক অকর্ম্মণ্য

লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দোব, দেখি মেয়েটা কি করে খায় পরে।

মন্ত্রী কি বলতে যাচ্ছিলেন, রাজা তাকে বাধা দিয়ে বললেন,—আপনি মনে করেছেন মেয়েটাকে বুঝিয়ে তার মত ফেরাবেন, তা ফেরাতে কখনই পারবেন না, তা আমি খুব জেনেই বলছি, তাই বলি, কালই একটা অকর্ম্মণ্য লোকের সন্ধানে চারদিকে লোক পাঠাবার বন্দোবস্ত করুন, যেন আমার কথার অন্যথা না হয়।

রাজার কথা মত মন্ত্রী চারদিকে লোক পাঠালেন। রাজার লোকেরা সন্ধান ক'রে ধনীর ঘানির তক্তে বসান সেই হাত-পা কাটা অকর্ম্মণ্য লোকটার কথা মন্ত্রীকে জানাল, মন্ত্রী রাজাকে জানালেন। রাজা শুনে তাকেই নিতান্ত অকর্ম্মণ্য জেনে সেই ভাগ্যহীন রাজার সঙ্গে ছোট মেয়ের বিয়ে দিলেন। পাছে ধনীর বাড়িতে রাখলে তিনি খেতে পরতে দেন, সেই ভেবে রাজা স্বতন্ত্র একটা কুঁড়ে ঘর বেঁধে তাইতে মেয়ে ও জামাই দুজনকে রেখে দিলেন।

রাণী কিন্তু মেয়ে জামাইকে একেবারে পর করতে পারলেন না। লুকিয়ে লুকিয়ে ঝিকে দিয়ে তাদের দুজনের মত খাবার পাঠাতে লাগলেন! রাজা এ বিষয় বিন্দু-বিসর্গও জানলেন না।

কিছুদিন যায়, একদিন শনিরাজ ও ভাগ্যবিধাতা, উভয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হলেন। রাজা পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজো ক'রে তাঁদের আগমনের কারণ জিজ্ঞেস্ করলেন।

ভাগ্যবিধাতা ও শনিরাজ বললেন,—রাজা, আমাদের দুজনের

মধ্যে কে বড়, তুমি বল। এই বিচারের জন্য তোমার কাছে এসেছি।

রাজা মহা ভাবনায় পড়লেন। একদিকে ভাগ্যবিধাতা অন্যদিকে শনিরাজ কেউ ছোট নন। ভাগ্যকে বড় করলে শনির কোপানলে দগ্ধ হবেন, আর যদি শনিকে বড় করেন তা'হলে ভাগ্য ছেড়ে যাবেন। এই উভয় সঙ্কটে প'ড়ে রাজা মহা ভাবনায় পড়লেন, কিন্তু কিছু ঠিক করতে পারলেন না, বললেন,—আচ্ছা, আপনারা আমায় এক মাসের সময় দিন, আমি ভেবে চিন্তে পরে বলব।

বেশ তাই হবে, আমরা একমাস পরে আসব, ব'লে উভয়ে চলে গেলেন।

তাঁদের বিচার ভার নিয়ে রাজা মহা বিব্রত হ'য়ে পড়লেন। রাজা ও রাণীর পেটে জল গলে না। এ কথা রাজমহলে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল। রাজবাড়ির সকলেই চিন্তিত হ'য়ে পড়ল।

রাজার ছোট মেয়ে ও নুলো জামাইকে খাবার দিতে গিয়ে ঝি সে কথা রাজকন্যার কানে তুললে। রাজকন্যা সে কথা স্বামীকে বললে। স্বামী বললেন,—ঝি এলে ব'লে দিও রাজামশাই যেন না ভাবেন, আমি তাঁর হ'য়ে উত্তর দোব—শাপ, বর, যা কিছু তা আমার ওপর দিয়েই যাবে,—তাঁর গায়ে আঁচ পর্য্যন্ত লাগবে না, এতে তিনি যদি রাজি হন আমায় যেন খবর পাঠান।

ঝি গিয়ে রাণীমাকে বললে। রাণী পাকে প্রকারে সেই কথা রাজাকে বললেন। রাজা শুনে ভাবলেন,—যা শত্রু পরে পরে।

ও অকর্ম্মণ্য জামাইটা দেবতাদের কোপে ধ্বংস হ'লে, মেয়েটাকে বাধ্য হ'য়ে আমার শরণ নিতে হবে। যেমন তার দর্প, সে দর্প চূর্ণ হবে, নিজের ভুল হাড়ে হাড়ে বুঝবে।



কে বড়, কে ছোট, আপনারা নিজেরাই বিচার করুন।

রাজা রাণীকে বললেন,—মেয়েকে ব'লে পাঠিও জামাই যেন ঠিক প্রস্তুত হ'য়ে থাকে, তাকে দিয়েই উত্তর দেওয়া হবে।

এক মাস গত হ'তেই রাজা কনিষ্ঠ জামাতাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন, রাজবেশ পরালেন, পোষাকে হাত-পা ঢেকে

সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন, স্বয়ং রাজা সাধারণ বেশে কিছু তফাতে রইলেন।

ভাগ্য ও শনি উভয়ে ঠিক সময়ে উপস্থিত হ'লেন, বললেন,—আমাদের বিষয়ে কিছু স্থির হ'য়েছে কি ?

তাঁদের উভয়কে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন ক'রে দুর্ভাগা রাজা ভাগ্যবিধাতাকে উদ্দেশ করে বললেন,—ভগবন্! আপনি আমার আগা-গোড়া সবই জানেন। আমি সামান্য রাজা হ'লেও, আপনার কৃপায় আমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। কিন্তু যেদিন হ'তে ব্রাহ্মণের হস্তে আপনাকে অর্পণ করলাম, সেইদিন হ'তেই আমার দুর্দ্দশা আরম্ভ হ'য়েছে। শনির দশা পেয়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পথের ভিখারি হ'য়েছি, পরে হাত-পা কাটা হ'য়ে, কি দুর্দ্দশায় যে দিন কাটাচ্ছি, তা আপনার অবিদিত নাই। এস্থলে কে বড়, কে ছোট, আপনারা নিজেই বিচার করুন, আমি আর কি বলব।

ভাগ্যহীন রাজার কথা শুনে, ভাগ্য ও শনি উভয়ে হেসে উঠলেন এবং রাজাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে অদৃশ্য হলেন।

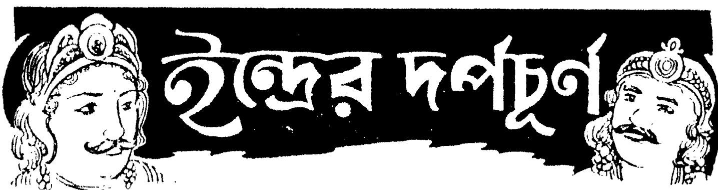
দেখতে দেখতে নুলো রাজার হাত পা গজিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি, মেধা, বল, বীর্য্য যা কিছু সবই দেখা দিল। শ্বশুর সবই শুনলেন, সবই দেখলেন। যে জামাতাকে তিনি একান্ত অকর্ম্মণ্য ভেবে, তার হস্তে মেয়েকে সমর্পণ ক'রে নিজের কথাটা বলবৎ করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, সে সবই পণ্ড হ'ল, শুধু পণ্ড নয়, সবই তাঁর বুঝবার ভুল জেনে বড় দুঃখ হ'ল, তাঁর দুই চোখে জল গড়াতে

লাগল। সেই অশ্রুমাখা চোখে রাজা, রাজ-জামাতার দু' হাত ধ'রে কৃত অপরাধ মার্জ্জনা করবার জন্যে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন।

কনিষ্ঠ রাজ-জামাতা, শ্বশুর-রাজকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা ক'রে বললেন,—"ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র।" যতদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে ততদিন তার দিন ভাল যায়, তার বিপরীত হ'লে নানা বিপদ এসে অশেষ দুঃখ দেয়।

রাজার দুর্ভাগ্য কেটে গেল। পুনরায় নিজ সিংহাসনে আরোহণ ক'রে পত্নীকে ল'য়ে পরম সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন।





মহাভারতের কথা।

মহর্ষি অঙ্গিরার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ বৃহস্পতি ও কনিষ্ঠ সংবর্ত্ত। দুই ভ্রাতাই পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক ও জপ তপে অনুরক্ত। দুই ভ্রাতায় সর্ব্ববিষয়ে মিল থাকিলেও জপ তপ লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ ঘটিত। একজন অপরকে হীন প্রতিপন্ন করায় উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া যাইত। শেষে সেই কলহ এমন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল যে, সংবর্ত্ত জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সামান্য কৌপীনমাত্র সম্বল করিয়া অরণ্যবাসী হইলেন।

পূর্ব্বে বৃহস্পতির পিতা মহর্ষি অঙ্গিরা ধার্ম্মিক নরপতি করন্ধমের কুলপুরোহিত ছিলেন। করন্ধমের মরুত্ত নামে এক পুত্র ছিল। মরুত্তের প্রতি সসাগরা পৃথিবী একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন, ঐ মহীপাল মরুত্ত স্বীয় শৌর্য্য বীর্য্যে এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকেও ভ্রুক্ষেপ করিতেন না। এজন্য দেবরাজ ইন্দ্র মরুত্তের প্রভাব হ্রাস করিবার মানসে তাঁহার হিতকামী

কুলপুরোহিত বৃহস্পতিকে আহ্বান করিয়া দেবগণ সমক্ষে * কহিলেন,—ভগবন্! যদি আপনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, তাহ'লে কখনও মরুত্তের পৌরোহিত্য স্বীকার করতে পারবেন না। কেননা আমি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই ত্রিলোকের অধীশ্বর, কিন্তু মরুত্ত কেবলমাত্র মর্ত্তলোকের অধিপতি। আমি অজর, অমর, আর মরুত্ত জন্মমৃত্যুর অধীন। আমা হেন সুরপতিকে পরিত্যাগ ক'রে কে কবে মর্ত্তের রাজা মরুত্তের যাজন ক্রিয়া ক'রে থাকেন ?

অতএব আপনি যদি মরুত্তের পৌরোহিত্য যেমন করছেন তেমনি করতে থাকেন, তবে তাই করতে থাকুন, কিন্তু মনে থাকে যেন আমার আশা চিরদিনের মত ত্যাগ করতে হবে। সুতরাং আমার ও মরুত্তের উভয়ের মধ্যে কাহার পৌরোহিত্য করবেন তাহা বলুন।

দেবরাজ ইন্দ্র এইকথা বলিলে তপোধন বৃহস্পতি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সুররাজকে বলিলেন,—দেবেন্দ্র, তুমি সমস্ত প্রাণীগণের অধীশ্বর—হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। অতএব তোমাকে ছেড়ে মর্ত্তলোকে মরুত্তের যাজন ক্রিয়া সম্পাদনে কোনই লাভ নাই। আর আমি সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, মরুত্ত কোন্ ছার—তোমাকে ছেড়ে মর্ত্তে কাহারও যাজন ক্রিয়া সম্পাদন করিব না।

সুররাজের সমক্ষে বৃহস্পতির প্রতিজ্ঞা মরুত্তের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া এক বৃহত্তর যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, এবং বৃহস্পতি সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—দেব, আপনার বেশ স্মরণ আছে যে, পূর্ব্বে আমি আপনার কথামত এক

যজ্ঞ করবার সঙ্কল্প করেছিলাম। এক্ষণে সেই যজ্ঞের যাবতীয় সামগ্রী আহরণ করেছি, যাহাতে ঐ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয় আপনি উপস্থিত থেকে তার ব্যবস্থা করুন।

বৃহস্পতি বলিলেন,—বৎস, আমি কেবল দেবরাজ ইন্দ্রের পৌরোহিত্য করিব অন্য কারও করিব না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছি। অতএব তোমার যজ্ঞে কি ক'রে যোগদান করি বল? তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ।

রাজা কহিলেন, আমি আপনার পৈত্রিক যজমান এবং আপনাকে যথেষ্ট সম্মান ক'রে থাকি, আপনি যদি আমার যজ্ঞ সম্পাদন না করেন তবে কে করবে? আপনাকে করতেই হবে।

রাজার দৃঢ়বাক্যে বৃহস্পতি উষ্মা প্রকাশ পূর্ব্বক গর্ব্বিত বচনে বলিলেন,—আমার এখন পদমর্য্যাদা যে কত, তা তুই মূর্খ কি ক'রে জান্‌বি বল্! যে ইন্দ্রত্ব পাবার জন্য মানুষ কত কঠোর সাধ্য-সাধনা করে, সেই দেবরাজ ইন্দ্র আমায় পৌরোহিত্যে বরণ করেছেন, আমি তোর সংস্পর্শে থাকতে চাই না,—ভাল চাস্ ত দূর হ!

বৃহস্পতির রূঢ়বাক্যে রাজা হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না কেন গুরুদেব তাঁহাকে অকারণে ভৎ র্সনা করিলেন।

নরপতি মরুত্ত বৃহস্পতির নিকট প্রত্যাখ্যাত, ভৎ র্সিত ও লজ্জিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নারদকে দেখিয়া রাজা তাঁহাকে

অভিবাদন করিয়া বিষণ্ণ মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। দেবর্ষি নারদ ইহার কারণ জানিবার জন্য বলিলেন,—রাজন্! আজ তোমার মুখ এত বিষণ্ণ দেখছি কেন? কোন অমঙ্গল হয় নাই ত? তুমি কোথায় গিয়াছিলে? তোমার অপ্রসন্নতার কারণ কি? যদি বলবার বাধা না থাকে, বল, আমি সাধ্যমত তোমার দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করব।

নারদ এই কথা বলিলে নরপতি মরুত্ত তাহাকে বলিলেন,—দেবর্ষে! আমি কুলগুরু বৃহস্পতির কথামত যজ্ঞের সমুদয় সামগ্রী আহরণ ক'রে তাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ করবার জন্যে তাঁর নিকট গিয়াছিলাম, তিনি আমায় রূঢ়বাক্যে দূর করে দিয়েছেন, জানিনা প্রভু, তাঁর শ্রীচরণে কি অপরাধ করেছি! ব'লে অধোমুখে অশ্রুত্যাগ করতে লাগলেন।

মরুত্তের চক্ষে জলধারা নির্গত হইতে দেখিয়া নারদ বেশ বুঝিলেন যে, নরপতির প্রাণে কি বিষম আঘাত লাগিয়াছে। তিনি রাজাকে অভয় দিয়া বলিলেন,—বৃহস্পতি যদি তোমার পৌরোহিত্য না করেন তাতে এত দুঃখিত হ'বার কারণ দেখিনা,—কেননা তাঁর ভাই সংবর্ত্ত তপস্যা এবং সর্ব্ব বিষয়ে বৃহস্পতির অপেক্ষা অনেক বড়। তিনি দাদার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হ'য়ে কৌপীনমাত্র সম্বল ক'রে গৃহত্যাগ করেছেন, তাঁর দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করলে খুব ভালই হবে। নাই বা বৃহস্পতিকে পেলে? তাই বলি তুমি সংবর্ত্তের নিকট গিয়ে তাঁকে প্রসন্ন কর, তোমার কার্য্যোদ্ধার হবে।

দেবর্ষি নারদের মুখে যজ্ঞ সম্পাদনের উপায় শুনিয়া, রাজা পুলকিত হইলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সে আনন্দ তিরোহিত হইল। তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, কি প্রকারে অরণ্য নিবাসী তপোপরায়ণ সংবর্ত্তের সাক্ষাৎ মিলিবে! এই কথা স্মরণ করিয়া রাজা নারদকে বলিলেন,—ঋষিবর! আপনি যে সৎযুক্তি দিলেন, তাই শুনে আমার প্রাণে যে কি আনন্দ হচ্ছে তা বলবার নয়, তবে প্রভু সংবর্ত্ত কোথায় আছেন? কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাব, দেখা পেলেই বা কি বলব, এই সব আপনি দয়া ক'রে বলে দিন, নচেৎ আমি তাঁর কাছে যেতে সাহস পাচ্ছিনা। আর যদি তিনিও আমায় উপেক্ষা করেন, তাহ'লে জানবেন আমি এ প্রাণ আর রাখব না।

দেবর্ষি নারদ রাজাকে স্তোকবাক্যে তাঁহার দুঃখ প্রশমিত করিয়া বলিলেন,—মহারাজ! সংবর্ত্তের সাক্ষাৎ পাওয়া উপস্থিত অধিক কষ্টকর নয়। তিনি এতই শিবভক্ত হ'য়ে উঠেছেন যে, তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করবার মানসে মন্দিরে প্রবেশ করেন। তুমি বারাণসীতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দ্বারে একটা মৃতদেহ রেখে দেবে। যাকে দেখবে সেই শবটা দেখে মন্দিরে না ঢুকে পালাচ্চে তুমি সেই লোকের পিছু নিবে, এবং তাঁকে নির্জ্জনে পেয়ে সকল কথা বলবে। আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে বলবে, দেবর্ষি আপনার সন্ধান ব'লে তিনি অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করেছেন।

দেবর্ষি নারদ রাজাকে এইরূপ উপদেশ দান করিয়া প্রস্থান করিলে,

মরুত্ত তাঁহার বাক্য অনুযায়ী বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দ্বারে এক মৃতদেহ স্থাপিত করিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে মহর্ষি সংবর্ত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া শবদেহ দর্শনমাত্র প্রস্থানোদ্যত হইলে মরুত্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন। কিছুদূর গমনের পর এক নির্জ্জন স্থানে সংবর্ত্তের সম্মুখীন হইলেন। সংবর্ত্ত রাজাকে দর্শনমাত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গাত্রে কর্দ্দম, শ্লেষ্মা ও নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তথাপি মরুত্ত নিবৃত্ত হইলেন না, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার মানসে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সংবর্ত্ত অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া যখন এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তখন মহারাজ মরুত্ত করযোড়ে অতি দীনভাবে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন।



তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার মানসে পশ্চাতে পশ্চাতে

রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া মহর্ষি সংবর্ত্ত বলিলেন,—রাজন্, আমার নিকট আগমনের কারণ কি? কেই বা আমার সন্ধান ব'লে দিল! যদি সত্য সত্যই আমার সহিত সাক্ষাতের তোমার বিশেষ প্রয়োজন হয়, তা'হলে তোমার সকল মনোরথ পূর্ণ হবেই হবে; আর যদি মিথ্যা করিয়া আমার সন্ধান জান্‌তে এসে থাক, তা'হলে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত জেনো।

মরুত্ত বলিলেন,—ভগবন্! আমি অকারণে আপনার নিকট আসিনি, বিশেষ কার্য্যবশতই এসেছি। আমার অন্তরের দুঃখ ঋষিরাজ অবগত হ'য়ে, তিনি আপনার নির্দ্দেশ ব'লে দেন তা'তেই আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে যে, কি পর্য্যন্ত উপকৃত হ'য়েছি তা বলবার নয়।

সংবর্ত্ত সহাস্যে বলিলেন, রাজন্, তুমি যথার্থই বলেছ। এক্ষণে নারদ কোন্ স্থানে অবস্থান করছেন বলতে পার?

রাজা বলিলেন,—দেবর্ষি, আপনার সন্ধান ও আপনার নিকট আসতে ব'লে দিয়ে, অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করেছেন।

ইহাতে সংবর্ত্ত রাজার প্রতি তুষ্ট না হইয়া রুষ্ট হইলেন। বলিলেন,—তুমি কি ব'লে আমার নিকট এলে? তুমি ত আমার বিষয় সবই জান,—জান যে আমার মনের ঠিক নাই, কখন কি ক'রে বসি তার ঠিক ঠিকানা নাই। এ লোককে নিয়ে তোমার কি কাজ হবে? তার চেয়ে আমার পরম পূজ্য, শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ মহর্ষি বৃহস্পতি যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের পৌরোহিত্য করছেন তাঁকে দিয়ে যজ্ঞ সমাপন

কর তাতে ফল খুব ভালই হবে। আমিও তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন কাজে যোগ দিতে পারব না। অতএব তোমার যদি আমার দ্বারা যজ্ঞ করাবার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, দাদার অনুমতি নিয়ে এস তাতে আমি দ্বিরুক্তি করব না।

রাজা বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! আপনার নিকট উচিত কথা বলতে দোষ কি, আমি আপনার দাদা কুলগুরু বৃহস্পতির নিকট গিয়াছিলাম। তিনি এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্রের পৌরোহিত্য করছেন—তিনি বলেছেন,—মর্ত্তে কারও যাজন ক্রিয়ায় যোগদান করবেন না, এমন কি আমারও না। বিশেষ সুররাজ ইন্দ্র আমার প্রতি হিংসাপরবশ হ'য়ে তাঁকে আমার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করতে নিষেধ ক'রে দিয়েছেন; আর আপনার ভ্রাতাও ইন্দ্রের সেই বাক্যে সম্মত হ'য়েছেন। আমি স্নেহবশতঃ তাঁর নিকট গমন করেছিলাম, তিনি আমায় অকারণে লাঞ্ছিত ক'রে বিতাড়িত করেছেন,—তাই আপনার আশ্রয়ে এসেছি। ইন্দ্র যেমন আমার যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন, আমিও ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করবার জন্যে যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে আপনার দ্বারা যজ্ঞ সমাধা করবার মনন করেছি। মহাত্মন্! দয়া প্রকাশে আমায় এ দায় হ'তে উদ্ধার করুন।

মহর্ষি সংবর্ত্ত বলিলেন,—রাজন, আমি যদি তোমার পক্ষ নি, তার পরিণাম একবার ভেবে দেখেছ কি? আমি পৌরোহিত্য করতে গেলেই, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি তোমার ভয়ানক শত্রু হয়ে দাঁড়াবেন। হয়ত সেই সময়ে ভয়ে তুমি আমায় ছেড়ে দিয়ে ওদের দলে গিয়ে পড়বে।

সেই ধাক্কা সামলাতে পারবে কি না সেইটিই ভাববার কথা! আর যদি তাই হয়, তুমি জানবে, তোমারও নিস্তার নাই, তোমায় আমি সবংশে নিপাত করব তা তুমি জেন! তাই বলি, যা বলতে হয় এই সময় ভেবে চিন্তে বল।

রাজা বলিলেন,—ভগবন্! আপনার কাছে আমার এই প্রতিজ্ঞা এবং চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী ক'রে ব'লছি, আমি জীবনে কখনও আপনাকে পরিত্যাগ করব না,—এবং এ কথা যদি মনেও উদয় হয়, তা'হলে যেন আমার নরক বাস হয়।

রাজার এইরূপ প্রতিজ্ঞায় মহর্ষি সংবর্ত্ত মহা খুশি হইয়া বলিলেন,—রাজন্! তোমার সরল বাক্যে কি পর্য্যন্ত যে আনন্দ লাভ করলাম তা বলবার নয়। এক্ষণে যজ্ঞ কার্য্যে কি করা উচিত তাই উপদেশ দিতেছি মন দিয়ে শুন। হিমালয়ের অনতিদূরে মুঞ্জমান নামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে হর-গৌরী ভূত, প্রেত প্রভৃতি সঙ্গী লয়ে বাস করছেন। তুমি অন্যান্য দেবতা যথা,—কুবের, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবতাদিগের অনুকরণে দেবাদিদেবকে নমস্কার ক'রে তাঁর শরণাপন্ন হ'লে দেখবে কোথা হ'তে তাল তাল সোনা তোমার জন্য রক্ষিত হ'য়েছে,—তুমি সেই সোনা হ'তে যজ্ঞপাত্র নির্ম্মাণ করবে। অতএব তুমি এই বেলা মুঞ্জমান পর্ব্বতে সোনা আনতে লোক পাঠিয়ে স্বয়ং তথায় গমন কর।

মহাত্মা সংবর্ত্ত এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, মহারাজ মরুত্ত ক্ষণবিলম্ব না করিয়া মুঞ্জমান পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক ভবানীপতির স্তব

করিতে লাগিলেন। মহাদেব স্তবে তুষ্ট হইয়া রাশি রাশি সুবর্ণ রাজাকে প্রদান করিলেন। সেই সুবর্ণে শিল্পী কর্ত্তৃক নানাবিধ পাত্র নির্ম্মিত হইল। এদিকে বৃহস্পতি রাজা মরুত্তের যজ্ঞের সমারোহ ব্যাপারের কথা অবগত হইয়া যখন জানিলেন যে, ঐ সকল সুবর্ণ নির্ম্মিত সামগ্রী যজ্ঞের পুরোহিত তাঁর ভ্রাতা সংবর্ত্তকে দান করা হইবে, তখন বৃহস্পতির ক্ষোভ ও দুঃখের সীমা রহিল না, ভ্রাতার ঐশ্বর্য্যের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার শরীর দিন দিন বিবর্ণ হইতে লাগিল।

কুলগুরু বৃহস্পতিকে সন্তপ্ত দেখিয়া দেবরাজ সাঙ্গপাঙ্গ লইয়া বৃহস্পতিকে নিবেদন করিলেন,—মহাত্মন্! আপনার বিমর্ষভাবের কারণ কি? আমার লোকের দ্বারা আপনার যদি কিছু ত্রুটি হ'য়ে থাকে দয়া ক'রে বলুন, আমি তৎক্ষণাৎ উহার খণ্ডন করব। আপনাকে দিন দিন ক্ষয় পেতে দেখে মনে হয়, আমার লোকেরা আপনার সেবা শুশ্রূষা ঠিক করতেছে না।

বৃহস্পতি বলিলেন,—না দেবরাজ, আমার সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হয় নাই; তারা নিরন্তর আমার সেবায় নিযুক্ত থাকে,—তাদের মঙ্গল হোক্।

দেবেন্দ্র বলিলেন,—তবে আপনার মুখশ্রী দিন দিন মলিন ভাব ধারণ করতেছে এর কারণ কি? নিশ্চয় এমন কিছু ঘটেছে যাতে আপনাকে পীড়িত করছে। এবং যারা আপনার মনোবেদনার কারণ তাদের আমি যৎপরোনাস্তি সাজা দিয়ে আপনাকে তুষ্ট করব।

বৃহস্পতি বলিলেন,—দেবরাজ, আমি শুনেছি রাজা মরুত্ত প্রভৃত

দক্ষিণাদান দিবার ব্যবস্থা ক'রে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছে। আমার ভ্রাতা সংবর্ত্ত সেই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করবেন। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে, সংবর্ত্ত মরুত্তের যাজন কার্য্য না করে।

সুররাজ ইন্দ্র বলিলেন,—প্রভু! এতে আপনার ক্ষোভের কারণ ত কিছু দেখি না। আপনি দেবগণের পুরোহিত, আপনার সকল কামনাই পূর্ণ হ'য়েছে; সংবর্ত্ত আপনা হ'তে অনেক নিকৃষ্ট, তাকে ভয় করবার কি আছে? বরং সেই আপনাকে ভয় করবে।

বৃহস্পতি বলিলেন,—দেবরাজ, তুমি নিজের দিক হ'তে দেখ না কেন, যখন অসুরগণের মধ্যে কেহ প্রবল হ'য়ে উঠে, তুমি তখনই তাকে দমন কর, শত্রুকে বাড়তে দাও না। সংবর্ত্ত আমার মহা শত্রু, তার বৃদ্ধি আমার পক্ষে অসহ্য! মরুত্তের যাজন ক্রিয়া ক'রে, প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ ক'রে, সে যে আমায় অতিক্রম করবে, এ আমি কখনই বরদাস্ত করতে পারব না! ঐ ভাবনাই আমার প্রবল হ'য়েছে, আমায় জীর্ণ শীর্ণ ক'রে ফেলেছে! যদি আমার মঙ্গল চাও উভয়ের মধ্যে একজনকে নিপাত কর!

সুরগুরু বৃহস্পতি এ কথা কহিলে দেবেন্দ্র অগ্নিকে বলিলেন,—হুতাশন, তুমি গুরুদেবকে সঙ্গে ল'য়ে মরুত্ত রাজাকে গিয়ে বল, এই সুরগুরু তোমার যাজন ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক তোমায় অমরত্ব দান করবেন।

দেবরাজের আজ্ঞামাত্র হুতাশন তাঁহার তেজোময় শরীর ধারণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড উল্কাপিণ্ডের ন্যায় বৃহস্পতির সহিত মরুত্তের নিকট

উপস্থিত হইলেন। মরুত্ত কর্তৃক বিবিধ প্রকারে সম্মানিত ও পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সংপূজিত হইয়া বলিলেন,—রাজন্, তোমার অভ্যর্থনায় বড় আনন্দ লাভ করলাম।

মরুত্ত বলিলেন,—অতি উত্তম। দেবরাজ ইন্দ্রের সব কুশল ত? তিনি আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন ত?

অগ্নি বলিলেন,—রাজন, সুররাজের সব কুশল। তিনি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী, অন্য অন্য দেবতারাও তোমাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন। তিনি কুল গুরু বৃহস্পতিকে তোমার নিকট পাঠিয়েছেন, কারণ এই যে, তোমার যজ্ঞের ভার এই বৃহস্পতিকে দিয়ে যাজন ক্রিয়া সম্পাদন ক'রে অমরত্ব লাভ কর।



যদি আমার মঙ্গল চাও, উভয়ের মধ্যে একজনকে নিপাত কর!

মরুত্ত বলিলেন,—মহাত্মন্! মহর্ষি সংবর্ত্ত আমার যাজন ক্রিয়া সম্পাদনে ব্রতী হ'য়েছেন। আর বৃহস্পতিই বা অমর দেবরাজের পৌরোহিত্য ত্যাগ ক'রে, মৃত্যুর বশবর্ত্তী মরুত্তের যাজন ক্রিয়া কেমন ক'রে করবেন।

অগ্নি বলিলেন,—তা হোক্, দেবরাজ তা'তে কিছু অপমানিত বোধ করবেন না, বরং সন্তুষ্ট হবেন এবং আপনার যশ, মান, আয়ু বৃদ্ধি হ'য়ে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে।

এই রকমে অগ্নি মরুত্তকে বিবিধ বাক্যের দ্বারা প্রলোভিত করিতে লাগিলেন। সংবর্ত্ত আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন,—অনল! তুমি এই দণ্ডেই প্রস্থান কর! আর কখন বৃহস্পতিকে নিয়ে মরুত্ত রাজার কাছে এস না! যদি আবার দেখি! তোমায় সেই দণ্ডেই ভস্ম করে ফেলব!

হুতাশন একান্ত ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বৃহস্পতির সহিত সুররাজের নিকট উপস্থিত হইলেন।

দেবরাজ উহাঁদিগকে প্রত্যাগত দেখিয়া বলিলেন,—হুতাশন, তোমার সঙ্গে বৃহস্পতিকে মরুত্ত রাজার নিকট পাঠিয়ে দিলাম, তুমি তাঁকে নিয়ে ফিরে এলে এর কারণ কি?

অগ্নি বলিলেন,—রাজন্! মরুত্তকে আপনার সকল কথাই বললাম। কিন্তু পূর্ব্বেই তিনি সংবর্ত্তকে যজ্ঞের ভার অর্পণ করায় প্রত্যাখ্যান করলেন,—আমার বারংবার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না। সে বললে সংবর্ত্তই আমার যাজন ক্রিয়া সম্পন্ন

করবেন। তারপর বললে কি জানেন,—বৃহস্পতি যজ্ঞ করলে যদি আমি উৎকৃষ্ট মনুষ্যলোক ও সসাগরা পৃথিবীর রাজা হই, তবু আমি সুরগুরু দ্বারা যজ্ঞ সমাপন করব না।

দেবরাজ ইন্দ্র তথাপি নিরস্ত হইলেন না, বলিলেন,—হুতাশন, তুমি পুনরায় মরুত্ত রাজার কাছে যাও। যদি এবারেও সে আমার কথা না রাখে, তাহ'লে তাকে বজ্র প্রহার করব।

অগ্নি বলিলেন,—রাজেন্দ্র, আমি আর যেতে পারব না। সংবর্ত্তের যে মূর্ত্তি দেখে এসেছি, এবারে গেলে নিশ্চয় ভস্ম ক'রে ফেলবেন। তিনি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, যদি তুমি পুনরায় বৃহস্পতিকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এস, তা'হলে তোমায় ভস্ম ক'রে ফেলব, কেউ তোমায় রক্ষা করতে পারবে না।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—বল কি! তোমায় ভস্ম করবে! এ কি কখন সম্ভব! তুমিই ত সকলকে ভস্ম ক'রে বেড়াও, তোমার ওপর কে আছে তা ত জানি না! তুমি নিতান্ত বাতুলের মত কথা ব'লছ, তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না।

অগ্নি বলিলেন,—আচ্ছা, আপনার কথা ভেবে দেখুন দেখি। আপনি ত্রিলোকের অধীশ্বর, তেত্রিশ কোটি দেবতা আপনার অধীন, তবে কেন বিত্রাসুর আপনাকে পরাস্ত ক'রে স্বর্গরাজ্য অধিকার করেছিল।

দেবরাজ নিজের পরাক্রমের কথা উল্লেখ করিয়া আস্ফালন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—সে কি জান, দুর্ব্বলের প্রতি বলপ্রকাশ কাপুরুষের কার্য্য। তুমি কি আমার বলের কথা অবগত নও।

দুর্ব্বৃত্ত কালকেয়গণ যখন অত্যন্ত অত্যাচারী হ'য়ে উঠে, তখন তাদের পৃথিবী থেকে বিতাড়িত ক'রে কি দুর্দ্দশা করেছিলাম তা তুমি জান। আর দানব কোন্ ছার, স্বর্গ হ'তে প্রহ্লাদকে পর্য্যন্ত দূরীভূত করেছি। মরুত্ত ত মর্ত্তের লোক। ও আমার সঙ্গে শত্রুতা ক'রে ক' দিন বাঁচবে।

অগ্নি বলিলেন,—দেব, শর্য্যাদি রাজার যজ্ঞকালে মহর্ষি চ্যবন যখন যজ্ঞভার গ্রহণ ক'রে অশ্বিনীকুমারদিগের সহিত সোমরস পান করেন, তখন আপনি নিষেধ করেছিলেন। তিনি আপনার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। আপনি রাগে বজ্র প্রহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু চ্যবন তা'তে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে তপোবনে মদ নামে এক বিকটাকার অসুরের সৃষ্টি করেছিলেন। সেই অসুর যখন শূল উদ্যত ক'রে আপনার প্রতি ধাবিত হয়, তখন আপনি প্রতিরোধ না ক'রে তার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। অতএব, হে দেবেন্দ্র, এতে বেশ বুঝা যায় না কি যে, ক্ষত্রিয় বল অপেক্ষা ব্রহ্মবল শ্রেষ্ঠ, আর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বলবান আর কেহ নাই। আমি ব্রহ্মতেজ বিলক্ষণ অবগত আছি বলেই সংবর্ত্তকে ভয় করি।

ইন্দ্র বলিলেন,—ব্রহ্মতেজ ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা আমি অবগত হ'য়েও মরুত্ত রাজার দর্প চূর্ণ করবই করব। তাকে বজ্র প্রহার ক'রে নিপাত করব তবে আমার নাম। পরে গন্ধর্ব্বপতি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—তুমি শীঘ্র মরুত্ত রাজার নিকট যাও এবং তাকে বল, সে যদি বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ না করে তা'হলে দেবরাজ তোমায় বজ্রাঘাতে নিপাত করবে।

দেবরাজের আজ্ঞামাত্র ধৃতরাষ্ট্র মরুত্তরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—মহারাজ আমার নাম ধৃতরাষ্ট্র, আমি গন্ধর্ব্বকুলে জন্মগ্রহণ করেছি,—এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্র যে জন্য আপনার নিকট আমায় প্রেরণ করেছেন, তা বলি শুনুন। দেবেন্দ্র বলেছেন, যদি আপনি বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ না করেন, তিনি নিশ্চয়ই আপনার প্রতি বজ্র প্রহার করবেন।

মরুত্ত বলিলেন,—গন্ধর্ব্বরাজ, শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি যে, দেবতাকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে এত নীচ প্রবৃত্তি কি ক'রে হ'ল। তোমরা কি জাননা, যে-লোক মিত্রদ্রোহী,—সে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। এ কথা কি তোমার, কি ইন্দ্রের কি বসুগণের, কি অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের কারও বিদিত নাই? কিন্তু আমি কখনই আমার পরম মিত্র সংবর্ত্তকে পরিত্যাগ ক'রে বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করব না। সুরগুরু বৃহস্পতি বজ্রধর দেবরাজের পৌরোহিত্য যেমন করেছেন তেমনি করতে থাকুন, আর মহর্ষি সংবর্ত্ত আমার যজ্ঞ সম্পাদন করুন, এই আমার শেষ কথা, ইহার অন্যথা আমি প্রাণ গেলেও করতে পারব না।

এই কথা শেষ হইবামাত্র ধৃতরাষ্ট্র ঊর্দ্ধদিকে আঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—মহারাজ ঐ দেখুন ভগবান শতক্রতু আপনার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করবার জন্য আকাশ পথে ভীষণ সিংহনাদ কচ্ছেন। যদি নিজের মঙ্গল চান এখনও মতি পরিবর্ত্তন করুন।

গন্ধর্ব্বরাজ এ কথা কহিলে, মরুত্ত অতিমাত্র ভীত হইয়া মহর্ষি

সংবর্ত্তকে বলিলেন,—ভগবন্! সুররাজ অনেক দূরে আছেন বলেই, আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু নিকটে এসে যদি বজ্রপ্রহার করেন, তা'হলে আর নিস্তার নাই, আমরা এবং সভাস্থ সকলেই কাল কবলে পতিত হব। ঐ দেখুন দেবরাজ বজ্র ধারণ পূর্ব্বক দশদিক আলোকিত ক'রে আসছেন। উহাঁর ভয়ঙ্কর নিনাদে সভাস্থ সকলেই সন্ত্রাসিত ও ব্যাকুলিত হচ্ছে।

সংবর্ত্ত বলিলেন,—মহারাজ, ইন্দ্র হ'তে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি বিদ্যাপ্রভাবে উহার সমুদয় কার্য্য পণ্ড করে দোব। হুতাশন তোমার মঙ্গল বিধান করুন আর নাই করুন, ইন্দ্র তোমার বিপক্ষে বজ্রপ্রহার করুন বা না করুন, তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি নিশ্চিন্ত চিত্তে থাক, তোমার কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ করতে পারবে না। এক্ষণে কি করলে তুমি সুখী হও বল, আমি তাই করব।

মরুত্ত বলিলেন,—ভগবন্! আমার একান্ত ইচ্ছা দেবগণ সঙ্গে দেবরাজ এ যজ্ঞে উপস্থিত হন।

সংবর্ত্ত বলিলেন,—এই কথা!—ঐ দেখ, দেবরাজ সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে যজ্ঞে উপস্থিত হচ্ছেন।

কথা শেষ হইতে না হইতে দেবরাজ, দেবগণ সঙ্গে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞীয় সোমরস পানে রত হইলেন; এবং সেই হইতে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল।



গোবিন্দ হাড়ী

এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী। সংসারে একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কেহ ছিল না। বড় গরীব। কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চলে।

কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে উত্যক্ত করে,—তুমি বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আছ, মেয়ের বিয়ের নাম পর্য্যন্ত কর না, কেন বলত!

ব্রাহ্মণ বলে,—দেখ ব্রাহ্মণী, আমি বসে নাই,—হেন জায়গা নেই যেখানে না গেছি, সকলেই টাকা চায়। তোমার মেয়ে রাধিকা রূপসী হ'লে কি হবে, রূপ কেউ চায় না, চায় টাকা; আমাদের টাকার অভাব কি ক'রে মেয়ের বিয়ে হবে, তাই ভেবে সারা হচ্ছি।

ব্রাহ্মণীর তাতে রাগ পড়ল না, চোক মুখ ঘুরিয়ে বললে,—তোমার ও কথা শুনতে চাই নে! রোজ রোজ ঐ এক কথা শুনে কান ঝালা ফালা হ'য়ে গেছে! এই ব'লে দিচ্ছি, তিন দিনের ভেতর যদি মেয়ের বিয়ে না দাও তা'হলে আমি কি অনর্থ ঘটাব তা দেখে নিও!

ব্রাহ্মণও বললে,—দেখ ব্রাহ্মণী ! তিন দিন কেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আজ প্রাতে বিছানা থেকে উঠে যার মুখ দেখব তারই সঙ্গে রাধির বিয়ে দোব ;—জাত, কুল, মান্‌ব না, এই এক কথা দেখে নিও।

প্রাতে শয্যাত্যাগ ক'রে চোক মুছতে মুছতে সদর দরজায় পা দিতেই ব্রাহ্মণ দেখলে একুশ বাইশ বছরের এক যুবক গুটিকত শূয়োর নিয়ে সামনের মাঠ দিয়ে চলেছে।

ব্রাহ্মণ তাকে বাড়িতে ডেকে বললে,—তোমার বিয়ে হয়েছে ?

না এখনও হয় নি।

আমার একটি মেয়ে আছে, দেখতে খুব সুন্দরী, তাকে বিয়ে করবে ?

গলায় পৈতে দেখে মনে হচ্ছে আপনি ব্রাহ্মণ,—আপনার কন্যাকে বিবাহ করব এ কেমন কথা !

তুমি কি ?

আমি জাতিতে হাড়ী, শূয়োর চরিয়ে বেড়াই।

তা হোক্, আমি তোমাকেই মেয়ে দোব, তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে কিনা বল ?

এই ব'লে ব্রাহ্মণ মেয়ে রাধিকাকে ডাকিয়ে যুবককে দেখিয়ে দিলে, বললে,—এই আমার মেয়ে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আজ প্রথমে যার সঙ্গে দেখা হবে সেই আমার জামাতা।

পরে ব্রাহ্মণ কাতর হ'য়ে বললে,—তুমি বিয়েতে অমত ক'র না বাবা, এ ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার কর !

যুবক একটু চিন্তা ক'রে বললে,—আপনার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা।

ব্রাহ্মণ স্বর্গ যেন হাতে পেলে, আহ্লাদে গদ গদ হ'য়ে বললে,—জয় হোক্ মঙ্গল হোক্, একশ বচ্ছর পরমায়ু হোক্!—তোমার নাম কি বাবা?

আমার নাম গোবিন্দ হাড়ী।

শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম গোবিন্দ, আর আমার মেয়ের নাম রাধিকা, বেশ মিল খেয়েছে। এস বাবা এস, আজ আমার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া কর, রাত্তিরে দুই হাত এক ক'রে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার হ'য়ে গঙ্গা স্নান ক'রে বাঁচব।

এই ব'লে ব্রাহ্মণ ভাবী জামাতা গোবিন্দ হাড়ীর দুই হাত ধ'রে তাকে আদর ক'রে ঘরে বসিয়ে, কুটুম্ব গৃহে নিমন্ত্রণ করতে ছুটল। কিন্তু ব্রাহ্মণের অনাচারে কেহই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না, বরং ঐ বিবাহে সে যে সমাজচ্যুত হ'বে এই ভয় দেখালে। ব্রাহ্মণ তা'তে ভয় না পেয়ে, সেই রাত্রেই গোবিন্দের সহিত কন্যা রাধিকার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করলে।

পরদিন প্রাতে শুভকার্য্য সম্পন্ন হবার পর বর ব্রাহ্মণকে বললে,—এইবার আমার গৃহে আপনার কন্যাকে নিয়ে যাবার অনুমতি পেতে পারি কি?

নিশ্চয়। যখন তুমি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করেছ, তখন এ কন্যা এখন আর আমার নাই,—তোমার। তুমি একে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পার, এতে আমার অমত থাকতে পারে না।

ব্রাহ্মণের অনুমতি পেয়ে বর, এক হাতে কনে ও অপর হাতে শূকরদের গলার দড়ি ধ'রে মাঠের ওপর দিয়ে চলল।

যতক্ষণ দৃষ্টি চলল ব্রাহ্মণ ততক্ষণ তাদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইল, তারপর যখন আর দেখা গেল না, তখন চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ির ভেতর ঢুকল। ঢুকতেই ব্রাহ্মণীর কর্কশ স্বর তার কানে গেল। নিকটে যেতে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বললে,—তুমি ত জাত-কুল খুইয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হ'লে. একটা হাড়ীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে একেবারে বনবাসী করলে। তারপর একবারও ভাবলে না মেয়েটা কোথায় গেল! সে সব ত জানতে হয়! মেয়ের খোঁজ খবর নিতে হ'লে জামায়ের ঘর দোর ত সব জানতে হয়! শুধু মেয়ে পার করলেই হয় না!

ব্রাহ্মণীর কথায় ব্রাহ্মণের টনক নড়ল। সে যে, জামায়ের বাড়ি, ঘর, দোরের কথা না জেনে ভাল করে নি তা বুঝল, বুঝে ব্রাহ্মণীকে মিষ্ট কথায় বললে,—বড় ভুল হ'য়ে গেছে ব্রাহ্মণী! সত্যই ত, মেয়েটাকে যার হাতে সঁপে দিলাম, নামটা ছাড়া তার বাড়ি, ঘর দোরের কোন ঠিকানাই ত জিজ্ঞেস্ করিনি! আচ্ছা, তারা ত এই পথে গেছে, এক দৌড়ে আমি জিজ্ঞেস্ ক'রে আসছি।

ব'লে যেদিকে জামাই,—মেয়ে ও শূয়োরগুলোকে নিয়ে চলেছে সেই দিকে ছুটল।

ব্রাহ্মণকে বেশি দূর ছুটতে হ'ল না। খানিক দূর যেতেই দেখলে, শূয়োরগুলোকে নিয়ে একটা গাছতলায় বসে জামাই ও

মেয়ে উভয়ে কথা-বার্ত্তা কইছে। ব্রাহ্মণ তাদের নিকট উপস্থিত



অমনি গাছটা সাঁ সাঁ ক'রে যেতে লাগল।

হ'তেই গোবিন্দ প্রণাম ক'রে বললে,—আপনি আমার নিকট যখন ছুটে এসেছেন, তখন নিশ্চয় কিছু খবর আছে,—কি খবর বলুন ?

দেখ বাপধন! তোমায় আমি আমার কন্যা সম্প্রদান করেছি বটে, কিন্তু তোমার নাম ও জাতের পরিচয় ছাড়া অন্য পরিচয় তোমায় আমি জিজ্ঞাসাও করিনি আর তুমিও আমায় বলনি। সেই ভুলটা মনে পড়ায় তোমার বাড়ির ঠিকানা জানতে এসেছি।

তা ত বটেই, আমারও বলতে ভুল হ'য়ে গেছে, মাপ করবেন! আমার ঠিকানা আর কি দোব,—এই যে গাছের তলায় বসে আছি, এই গাছকে বললেই হবে,—"বৃক্ষ! গোবিন্দ হাড়ীর ঠিকানায় নিয়ে চল।" এই কথা বললেই গাছের একটা মোটা ডাল মাটিতে নুইয়ে পড়বে, আর আপনি সেই ডালে চড়ে চোখ বুজে বসে থাকবেন, গাছ চলতে চলতে যেখানে থামবে, সেইখানে চোখ খুললেই একটা লোককে দেখতে পাবেন, তাঁকে আমার ঠিকানা জিজ্ঞেস্ করলেই তিনি ব'লে দেবেন।

জামায়ের বাড়ির এমন অদ্ভুত ঠিকানা জেনে ব্রাহ্মণ অবাক্ হ'য়ে ঘরে ফিরল, ব্রাহ্মণীকে সব কথা বললে, ব্রাহ্মণীও ভাবলে, তাই ত, কি ব্যাপার!

রাধিকার বিবাহের পর দেখতে দেখতে ছমাস কেটে গেল। ব্রাহ্মণী একদিন কষ্টে-সৃষ্টে গুটিকত সন্দেশ তৈরী ক'রে ব্রাহ্মণকে বললে,—দেখ আমি চেয়ে-চিন্তে ছানা চিনি যোগাড় ক'রে এই সন্দেশ মেয়ে জামায়ের জন্যে করেছি, তুমি এই হাঁড়িটা নিয়ে মেয়ের কাছে যাও এবং তারা কেমন আছে সেই খবর নিয়ে এস।

ব্রাহ্মণ সন্দেশের হাঁড়িটা নিয়ে সেই গাছের কাছে গিয়ে বললে,—বৃক্ষ, আমায় গোবিন্দ হাড়ীর বাড়িতে নিয়ে চল।

বলবামাত্র গাছের একটা মোটা ডাল মাটিতে নুয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণ সন্দেশের হাঁড়িটা মাথায় নিয়ে চোখ বুজে সেই গাছের ডালে চুপটি ক'রে বসে রইল। অমনি গাছটা সাঁ সাঁ ক'রে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ যাবার পর গাছটা থেমে গেল। ব্রাহ্মণ চোখ চেয়ে দেখে, সে একটা মস্ত চৌমাথায় এসে পড়েছে। চারিদিকে বড় বড় বাগানবাড়ি। বাগানে রাশি রাশি ফুল ফুটে রয়েছে সৌগন্ধে চারদিক আমোদিত। ব্রাহ্মণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়িয়ে ভাবছে, এমন সময় একজন ভদ্রলোক একটা বাগান থেকে বেরিয়ে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস্ করলেন,—আপনি কোথা যাবেন ?

আমি গোবিন্দ হাড়ীর বাড়িতে যাব।

বটে,—আপনি এই উত্তর দিকের বড় রাস্তা ধ'রে সমান চলে যান। যেখানে এই রাস্তা শেষ হবে, আর যাবার পথ নাই দেখবেন, সেই বাড়িখানা গোবিন্দ হাড়ীর।

ব্রাহ্মণ উত্তর দিকে চলল। খানিক দূর গিয়ে দেখলে, দুটো যমদূতের মত লোক একজনকে ধ'রে তার মুখখানা সজোরে পাথরে ঘসছে, আর লোকটার মুখ পাথরে কেটে ঝুঁঝিয়ে রক্ত পড়ছে, কিন্তু আশ্চর্য্য সেই লোকটা অত যন্ত্রণা পেয়েও হিঃ হিঃ ক'রে হাসছে !

ব্রাহ্মণ স্বচক্ষে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। নিকটে

গিয়ে জিজ্ঞেস্ করলে,—তোমরা একে এমন ক'রে পীড়ন করছ কেন? এ তোমাদের কি করেছে?

যমদূত ছুটো রেগে বললে,—যাও যাও ঠাকুর! আমরা কিছু বলতে পারব না! তুমি যার কাছে যাচ্ছ তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস্ করগে!

ব্রাহ্মণ ভয়ে জড়-সড় হ'য়ে সেখান থেকে সরে পড়ল, সমান রাস্তা ধ'রে চলতে লাগল। আবার খানিক দূর গিয়ে দেখলে, একজন ধনীলোককে চারজন বেহারায় পাল্কি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে! পাল্কির সঙ্গে তকমাপরা এক দরোয়ান চলেছে। ধনী পাল্কিতে থাকবেন না, তিনি পাল্কি থেকে রাস্তায় নেমে পড়ছেন, আর দরোয়ান তাঁকে জোর ক'রে পাল্কিতে তুলে দিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে ব্রাহ্মণের মনে বড়ই বিস্ময় জন্মাল। পাল্কির কাছে গিয়ে দারোয়ানকে বললে,—এঁর ওপর জোর্ জুলুম্ করছ কেন?

ব্রাহ্মণের কথায় দরোয়ান ছচোখ লাল ক'রে কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলে বললে,—"যাও ঠাকুর! যাঁহা যাতা হায়, উসিকো যাকে পুছো!"

ব্রাহ্মণ তার মূর্ত্তি দেখে বুঝলে, আর একটা কথা বললেই মেরে বসবে, তাই সে আর কোন কথা না ব'লে চুপ্ চাপ্ সোজা পথে চলল। পথ চলেছে ত চলেছে, বিরাম নাই,—শেষে এমন এক স্থানে এসে পড়ল যেখানে পথ শেষ হ'য়েছে। দেখে সামনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ি, দ্বারে এক মস্ত ভুঁড়িওলা দারোয়ান পাহারা দিচ্ছে। ব্রাহ্মণ হতবুদ্ধির মতন দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল,—এ ত

দেখছি রাজার মত মস্ত অট্টালিকা। তার জামাই ত শুয়োর



যাও ঠাকুর, যাঁহা যাতা হ্যায় উসিকো যাকে পুছো……

চরিয়ে বেড়ায়, জাতিতে হাড়ী, সেই গরীব হাড়ীর এত বড় বাড়ি তা স্বপ্নের অতীত। আমি কোথায় এসে পড়েছি! পথ ভুল হয়

নাই ত? তাই ত কি করি! কোথা যাই! ব্রাহ্মণ এই রকম কত কি ভাবছে, এমন সময় দেখলে তার জামাই গোবিন্দ, পূর্ব্বের ন্যায় গুটিকত শূয়োর নিয়ে উপস্থিত। গোবিন্দ, শ্বশুরকে দেখে তার পদধূলি নিয়ে, প্রণাম ক'রে, অতি সম্ভ্রমে শ্বশুরকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল। মহলের পর মহল চলেছে শেষ নাই। প্রত্যেক মহল সাদা পাথরের উপর নক্সা করা, দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। ব্রাহ্মণ দেখতে দেখতে চলেছে, যেন ইন্দ্রভবনের মাঝ দিয়ে চলেছে। এই রকম, এক মহল, দু মহল ক'রে সাত মহল পার হ'য়ে দেখে, একটা সুসজ্জিত ঘরে কন্যা রাধিকা বেশভূষা ও অলঙ্কারে ভূষিতা হ'য়ে বসে আছে,—রূপ যেন ফেটে পড়ছে। পূর্ব্বে রাধিকার যে রূপ, যে সৌন্দর্য্য ছিল, এখন যেন সেই রূপ, সেই সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাধিকা যে খুব যত্নে, খুব সুখে আছে তা ব্রাহ্মণের বুঝতে বিলম্ব হ'ল না।

পিতাকে দেখেই রাধিকা শশব্যস্তে প্রণাম ও তাঁর পদধূলি মস্তকে নিয়ে বাড়ির কুশল সমাচার জিজ্ঞেস্ করলে। পিতাও কন্যার কুশল জিজ্ঞেস্ ক'রে, সন্দেশের হাঁড়ি কন্যার সম্মুখে রেখে বিশ্রাম করতে বসল। খানিক বিশ্রাম ও জলযোগের পর, ব্রাহ্মণ ও জামাতার মধ্যে নানা আলাপ হ'তে লাগল। গাছ থেকে নেমে ব্রাহ্মণ পথে যেতে যেতে যে যে ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিল সব কথাই বললে। আর এও বললে, একটা লোকের মুখ পাথরে ঘসে রক্তপাত করলেও তার মুখে হাসি ধরছিল না, এর কারণ জিজ্ঞেস্ করাতে গোবিন্দ তার

উত্তরে বললে,—দেখুন, আপনি যে পথ ধ'রে এখানে আসছিলেন এটা বৈকুণ্ঠে যাবার পথ। ঐ লোকটা বৈকুণ্ঠেই যাচ্ছিল, কিন্তু একটা পাপে তার বৈকুণ্ঠে যাবার পথে বিঘ্ন ঘটল। কথা কি জানেন, লোকটা খুব দাতা এবং পরোপকারী ছিল। লোকের বিপদে প্রাণ দিয়ে উপকার করত, আর পিতৃ-মাতৃ দায়গ্রস্ত লোককে টাকা-কড়ি দিয়ে কত রকমে যে তাদের উদ্ধার করত তা বলবার নয়; কিন্তু তা হ'লে কি হয়, লোকটা বড় দুর্মুখ ছিল, দুর্বাক্য না ব'লে কাকেও সাহায্য করত না, তাই বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণ সেই পাপের ক্ষয়ের জন্য তার মুখখানাকে পাথরে ঘসে রক্তপাত করতে দূতদের আজ্ঞা দিয়েছিলেন। লোকটা জানে এই রক্তপাতে তার পাপ ক্ষয় হচ্ছে, ক্ষয় হ'লেই বৈকুণ্ঠ লাভ হবে। তাই এত কষ্টের মধ্যেও তার মুখে হাসি ফুটে বেরুচ্ছিল।

আর কিছু দেখেছেন?

দেখেছি বৈ কি! বাবাজি, সেও বড় অদ্ভুত। একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক পাল্কি চড়ে যাচ্ছিলেন, এক চাপরাশ আঁটা দরোয়ান সঙ্গে চলেছে। বাবু কিন্তু পাল্কি চড়তে নারাজ, তাই তিনি পাল্কি থেকে জোর ক'রে রাস্তায় নেমে পালাতে যাচ্ছিলেন, দরোয়ান তাঁকে যেতে দিচ্ছিল না, জোর করে ধ'রে রেখেছিল। এর কারণ জিজ্ঞেস্ করতে দরোয়ান আমায় তেড়ে মারতে এল, বললে,—"যাঁহা যাতা হ্যায় উসিকো যাকে পুছো।" তাই তোমায় জানাচ্ছি এ কথা বলবার কারণ কি?

শুনুন তবে। যে লোকটা পাল্কি চড়ে যাচ্ছিলেন, তিনি মস্ত

ধনী, বহু টাকার মালিক; আবার অন্যদিকে খুব দাতা, বিশ্বস্ত ও গরীবের মা-বাপ। অল্পদিন হ'ল তাঁর প্রাণ বিয়োগ হয়েছে। ধনী, বৈকুণ্ঠে বাস করতে পাল্কিতে ক'রে যাচ্ছিলেন। পথের মাঝে তিনি শুনলেন, পুত্রদের পাপে তাঁর নরক বাস হবে। পাছে বেয়ারারা পাল্কি ফিরিয়ে নিয়ে নরকের পথে যায়, তাই তিনি পালিয়ে যাচ্ছিলেন, দরোয়ান তাঁকে যেতে না দিয়ে জোর ক'রে ধ'রে রাখছিল।

পুত্রেরা এমন কি দোষ ক'রেছে যাতে তাদের পাপে এমন পুণ্যাত্মার বৈকুণ্ঠ লাভ না হ'য়ে নরকে স্থান হচ্ছে?

কারণ এই যে, ধনী লোকটা ধার্ম্মিক ব'লে, এক বিধবা তার বিপুল সম্পত্তি ঐ ধনীর কাছে গচ্ছিত রাখে। এমন সময়ে ধনী মারা যান। ছেলেরা বিধবার অনেক টাকার লোভ সামলাতে না পেরে, রাতারাতি ঐ বিধবার প্রাণনাশ ক'রে সব টাকা আত্মসাৎ করতে ষড়যন্ত্র করে। ছেলেদের এই পাপেই পিতার নরক ভোগ ব্যবস্থা হয়েছে।

আহা! এমন সৎলোকেরও এমন অকাল কুষ্মাণ্ড পুত্রও জন্মায়, যা দ্বারা ধার্ম্মিক বাপ নরকগামী হন।

তা হয় বৈ কি। আবার বংশে ধার্ম্মিক বা সুসন্তান জন্মালে সাত পুরুষ নরক হ'তে উদ্ধার লাভ করেন।

তবে কি লোকটার উদ্ধারের উপায় নাই?

উপায় আছে। যদি কেউ ছেলেদের বুঝিয়ে ঐ পাপ কাজে নিবৃত্ত করতে পারে তবেই রক্ষা নচেৎ রক্ষা নাই।

আচ্ছা বাবাজি, যদি তোমার ঐ ছেলেদের ঠিকানা জানা থাকে ত আমায় বল, আমি তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে যাতে ঐ পাপ কাজে রত না হয়, তাই করব।

গোবিন্দ, ছেলেদের নাম ধাম ঠিকানা ব'লে একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললে,—ঐ ঘরে ঢুকে যা দেখবেন সেই দেখবার পর আপনাকে যে স্থানে নিয়ে যাবে ঐ স্থানের লোককে জিজ্ঞেস্ করলেই আপনাকে ঐ ধনীর বাড়ি দেখিয়ে দেবে। আপনি তাঁর ছেলেদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিধবাকে বাঁচাতে পারলেই ঐ ধনীর বৈকুণ্ঠ লাভ হবে।

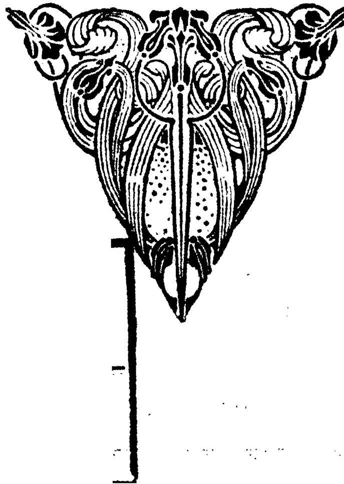
এই বলে গোবিন্দ অদৃশ্য হ'ল।

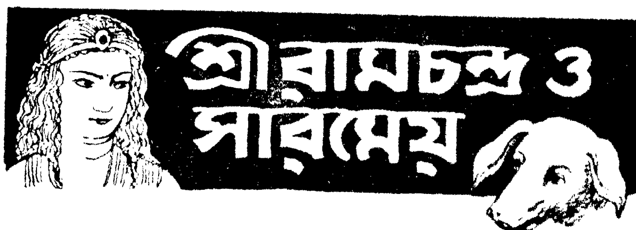
গোবিন্দ অদৃশ্য হ'তেই, ব্রাহ্মণ যেন নব কলেবর ধারণ করলে,—পাশের ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখলে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার যুগল রূপ স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট। ব্রাহ্মণ দেখে, অবাক্! কারণ শ্রীকৃষ্ণরূপী জামাতা গোবিন্দ, শ্রীরাধিকারূপিণী তার কন্যা রাধিকাকে বামে লয়ে উপবিষ্ট আছেন। সেই যুগল রূপ দর্শন ক'রে ব্রাহ্মণ ভাবে গদ গদ হ'য়ে তার মাথা আপনা হ'তেই যেমন তাঁদের পায়ে নত হ'ল, অমনি দেখে সে এক বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত।

খবর নিয়ে জানলে ঐ ধনীর দুই পুত্র বর্ত্তমান। তখন ব্রাহ্মণ উহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে পিতার দুর্দ্দশার কথা ব'লে বিধবার টাকা ফেরৎ দিতে বললে। প্রথমে পুত্রদ্বয় ব্রাহ্মণকে মিথ্যাবাদী ব'লে অনেক গালি দিলে, পরে ব্রাহ্মণের মুখে গোপন কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। তারা বুঝে ঠিক করতে পারলে না যে,

যে সব গোপন কথা তারা দুভাই ভিন্ন অন্য কেহ জানে না, সে সব গোপন কথা এই ব্রাহ্মণ কি ক'রে জানলে। ফলে দুভাই বিধবার সমস্ত গচ্ছিত সম্পত্তি ফেরং দিয়ে মুক্ত হ'ল, এবং সেই সঙ্গে পিতাকেও মুক্ত করলে।

পরে ব্রাহ্মণ নিজের বাড়িতে এসে ব্রাহ্মণীকে সব ঘটনা বলবামাত্র, জামাতা গোবিন্দ ও কন্যা রাধিকা উভয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা বেশে রথে চড়ে উপস্থিত হলেন, এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে সেই রথে চড়িয়ে বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেলেন।





অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণের প্রতি রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া, কয়েক দিবসের জন্য গুরুদেব মহাতপা বশিষ্ঠদেবের সহিত ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে এক সারমেয় রাজা রামচন্দ্রের সমীপে বিচারপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হয়। সারমেয় রাজ-সিংহাসনে শ্রীরামচন্দ্রের পরিবর্ত্তে লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া রাজা কোথায় এ কথা জিজ্ঞাসা করিল। লক্ষ্মণ বলিলেন,—তিনি কয়েক-দিনের জন্য আমার উপর রাজ্য পরিচালনার ভারার্পণ করিয়া গুরু মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে ধর্ম্মালোচনায় ব্যাপৃত আছেন। উপস্থিত বিচারভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, যদি তোমার কিছু নালিশ থাকে আমায় বল, আমি সাধ্যমত উহার সুমীমাংসা করিতে যত্নবান্ হইব।

লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে, সারমেয় তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল,—আমি লোক মুখে শুনিয়াছি শ্রীরামচন্দ্র মানবকুলে জন্মগ্রহণ

করিলেও তিনি স্বয়ং ভগবান্। এ কারণে সূক্ষ্ম বিচার আশায় অনেক দূরদেশ হইতে আগমন করিতেছি, যদি আপনি কৃপাপরবশ হইয়া এ হতভাগ্যের আবেদন রাজাকে জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে অত্যন্ত উপকৃত হইব।

তখন রামানুজ লক্ষ্মণ সারমেয়কে সঙ্গে লইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে সারমেয়ের সকল আবেদন ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র সারমেয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—তোমার কি অভিযোগ আমায় অকপটে বল।

সারমেয় সসম্ভ্রমে রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া বলিল,—মহারাজ! আমি যে গ্রামে বাস করি, সেই গ্রামে একজন বেদজ্ঞ নূতন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থ আসেন। সারমেয়ের স্বভাব আপনি বিলক্ষণ জানেন, নূতন লোক দেখিলেই তাহার পশ্চাতে চীৎকার করা আমাদের স্বভাব। সেই স্বভাববশতঃ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ যেখানে ভিক্ষা করিতে যান, আমিও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া বিকট চীৎকার করিতে থাকি। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া আমাকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করেন যে, সেই প্রহারেই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি, আমি যে বাঁচিয়া উঠিয়াছি উহা আমার পিতৃপুণ্য। মহারাজ! আমার নালিশের কারণ এই যে, তিনি যদি সাধারণ লোক হইতেন, তাহা হইলে আমার দুঃখ করিবার কিছুই ছিল না, কেননা সাধারণতঃ যাহারা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় তাহারা প্রায়ই মূর্খ হয়। মূর্খের অশেষ দোষ, এজন্য

তাহারা ক্ষমার পাত্র, কিন্তু এই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ, পণ্ডিত ও ধর্ম্মপরায়ণ। তাই জিজ্ঞাসা করি, ইনি ধার্ম্মিক হইয়া আমায় কেন অযথা প্রহার করিলেন, এজন্য তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া কি উচিত নয়? ইহার সূক্ষ্ম বিচারের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি ইহার সুবিচার করুন।

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—দেখ, সূক্ষ্ম বিচার করিতে হইলে, দুই পক্ষের কথা না শুনিলে বিচার করা যায় না। অতএব তুমি সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আমার নিকট উপস্থিত কর, তোমাদের উভয়ের বাদানুবাদ শুনিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।



লক্ষ্মণ সারমেয়কে সঙ্গে লইয়া বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে···

সারমেয় তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিয়া কিছুক্ষণ পরে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে রাজসমীপে আনয়ন করিল।

শ্রীরামচন্দ্র তখন উগ্রতপা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া বশিষ্ঠ দেবকে বলিলেন,—গুরো ! দেখিতেছি এ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তপোনিরত ও যোগী, এ হেন তপস্বীর বিচার কার্য্য সম্পন্ন করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। দেব ! আপনি এই বিচারের উপযুক্ত পাত্র, অতএব দয়া করিয়া আপনি ইহাঁর বিচার ভার গ্রহণ করুন, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

বশিষ্ঠদেব তখন ব্রাহ্মণকে সারমেয়ের প্রতি কঠোর শাস্তির কথা কহিয়া বলিলেন,—সত্যই কি আপনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, এই সারমেয়কে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন ?

হাঁ দেব ! কারণ, একদিন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়াছিলাম, নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দিবাবসানেও যখন কিছু মিলিল না, তখন দারুণ শ্রম ও ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়নে এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। সেই দারুণ মনোকষ্ট বহন করিয়া যখন ঘুরিতে ছিলাম, সেই সময়ে এই সারমেয় আমার পশ্চাতে থাকিয়া এরূপ বিকট চীৎকার করিতেছিল যে, আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলাম না, ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া আমার হস্তস্থিত যষ্টিদণ্ড দ্বারা নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছিলাম, ইহা আমার বেশ স্মরণ আছে।

বটে ! আপনার রাগ এরূপ প্রবল ?

হাঁ দেব !

আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও মহাতপা, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ক্রোধ যে মহাপাপ এ কথা স্বীকার করেন কি ?

নিশ্চয়।

তাই যদি হয়, যখনই আপনার মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে তখনই আপনি মহান্ পাপে লিপ্ত হইয়াছেন, এ কথা ঠিক কি না ?

ঠিক ত বটেই, এবং আমিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, এই সারমেয়কে নিদারুণ প্রহার করিয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি, এ অন্যায়ের জন্য আমায় কি শাস্তি দিতে হয় দিন।



সারমেয়কে প্রহার করিয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি ···

দেখুন, এখানে আর একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন কি ? বিষয়টি এই, মানুষের মধ্যে দুই শ্রেণী দেখা যায়। এক শ্রেণী পণ্ডিত, আর এক শ্রেণী মূর্খ। এই দুই শ্রেণী লোকের কার্য্যে বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়, এবং উভয়ের পাপের ফলাফলও

ভিন্ন রকমের। পণ্ডিত যিনি, তিনি জ্ঞান-পাপী ও মূর্খ অজ্ঞান-পাপী বলিয়া কথিত হয়। এ কারণে অজ্ঞানকৃত পাপী অপেক্ষা জ্ঞান কৃত পাপীর পাপ সহজে ক্ষয় হয় না, এজন্য তাঁরা অধিক শাস্তি ভোগ করেন। আপনি পণ্ডিত ও ধাম্মিক শিরোমণি, আর এই সারমেয় এক অপকৃষ্ট জীব, নূতন লোক দেখিলেই চীৎকার করা ইহাদের স্বভাব। ইহাতে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। এ বিষয় আপনি জ্ঞাত হইয়াও সারমেয়ের প্রতি অযথা পীড়নে আপনি দণ্ডার্হ এই কথাই আমি বলিতে চাই।

বশিষ্ঠদেবের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই, ব্রাহ্মণ কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান স্বরূপ বলিলেন,—দেব! আমি সারমেয়ের নিকটে বিশেষ অপরাধে অপরাধী, আপনি আমার প্রতি কঠোর শাস্তির বিধান করুন, আমি অম্লান বদনে সেই শাস্তি গ্রহণ করিব।

ব্রাহ্মণের মুখে এই কথা শ্রুত হইয়া বশিষ্ঠদেব সারমেয়কে বলিলেন,—এ ব্রাহ্মণ যে অতি সৎ, ধাম্মিক ও পণ্ডিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেননা স্বভাবতঃ কেহ নিজের দোষ স্বীকার করে না, কিন্তু এ ব্রাহ্মণ সে প্রকৃতির নহেন, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরলতায় প্রকাশ পাইতেছে। এক্ষণে ইহাঁর দণ্ড বিধান সম্বন্ধে তোমার উপর ভারার্পণ করিলাম, তুমি উহাকে যে দণ্ড দিবে, আমিও সেই দণ্ড দিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম।

সারমেয় বলিল,—অযোধ্যায় কপিঞ্জল নামে যে বৃহৎ অতিথিশালা

আছে সেই অতিথিশালার মহান্তপদ উঁহাকে প্রদান করা হউক, আমার বিবেচনায় এই দণ্ডই উঁহার পক্ষে যথেষ্ট।

বশিষ্ঠদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—সারমেয়, তুমি ব্রাহ্মণকে যে দণ্ড প্রদান করিলে, তাহা দণ্ড না পুরস্কার, আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।

সারমেয় বলিল,—দেব! বহির্দৃষ্টিতে দণ্ডের পরিবর্ত্তে পুরস্কার মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত কথা অবগত হইলে আমি ব্রাহ্মণকে যে কি কঠোর দণ্ড বিধান করিলাম তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইবেন। পূর্ব্বজন্মে আমিও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলাম এবং ঐ বৃহৎ অতিথিশালার মহান্তপদে অধিষ্ঠিত ছিলাম,—নানা প্রলোভন ও বিলাসিতায় ডুবিয়া, অতিথিদিগের সেবা ও যত্নের দিকে আদৌ দৃষ্টি রাখি নাই। সেইজন্য কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়,—সেই হেতু মহান্ পাপে লিপ্ত হই। আমি এ জন্মে জাতিস্মর হইয়া এই সারমেয় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। এখন ভাবিয়া দেখুন ঐ ব্রাহ্মণকে যে মহান্ত পদে অভিষিক্ত করিতে বলিলাম, ঐ পদ লাভ করিলে উনি পুরস্কৃত কি দণ্ডিত হইলেন, ইহা প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

সংসারের নানা প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া যিনি ধর্ম্মপালনে সমর্থ হয়েন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক ও তপস্বী।





রাজা বড়ই দৈবজ্ঞ-ভক্ত। প্রতি কাজ-কর্ম্মে এমন কি ওঠা বসা পর্য্যন্ত সকল ব্যাপারে দৈবজ্ঞ ভাস্করদেবের গণনা অনুসারে চলতেন।

এতটা কিন্তু রাণীর সহ্য হয় না। দু-একটা কাজের ফলাফল না হয় জিজ্ঞাসা করা বরং চলে। তা ব'লে প্রত্যেক কাজে রাজাকে পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে চলতে দেখলে, কোন্ রাণীর তা ভাল লাগে বল? শেষে রাণী একদিন অতিষ্ঠ হ'য়ে ব'লে উঠলেন,—আচ্ছা জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে না হয় তোমার চলতে পারে, কিন্তু রাজকন্যার ত চলবে না, তাকে উপযুক্ত পাত্র দেখে বিয়ে দিতে হবে, তার কি ব্যবস্থা করলে?

বল কি রাণী, চঞ্চলা কি এরই মধ্যে এত বড় হ'য়েছে?

তুমি ত সংসারের সব খবরই রাখ,—রাখবার মধ্যে ঐ এক গণকঠাকুর।

গণকঠাকুর ত আমাদের মঙ্গলই করেন, তাঁর উপর এত রাগ কেন ?

কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি ভাল নয়, তাই সাবধান ক'রে দিচ্ছি।

সংসার করতে গেলে শাস্ত্র মেনে চলা ভাল নয় কি ?

তুমি যা ভাল বুঝ কর। কিন্তু মেয়েটার বিয়ের একটা বিহিত ব্যবস্থা করা দরকার নয় কি ?

এই কথা,—আচ্ছা আজই দৈবজ্ঞঠাকুরকে ডাকিয়ে চঞ্চলার কোষ্ঠী গণনা করতে দোব।

সেই দিনই রাজা দৈবজ্ঞকে ডাকিয়ে চঞ্চলার কোষ্ঠীখানি হাতে দিয়ে বললেন,—দেখুন ত গণকঠাকুর, কোষ্ঠীতে মেয়ের কি লক্ষণ রয়েছে ?

কোষ্ঠীখানি হাতে নিয়ে বললেন,—যে আজ্ঞা মহারাজ, আজ আমি এই কোষ্ঠী নিয়ে চললাম, যত শীঘ্র পারি ভাগ্য গণনা ক'রে আপনাকে জানাব।

দৈবজ্ঞঠাকুর কোষ্ঠী গণনা ক'রে দেখলেন যে,—রাজকন্যাকে যে বিয়ে করবে, সে যত সামান্য ব্যক্তিই হোক্ না কেন, ভাগ্যচক্র পরিবর্তনে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজচক্রবর্ত্তী হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। গণকঠাকুর রাশি রাশি কোষ্ঠী গণনা করেছেন, কিন্তু এই রাজকন্যার ন্যায় সুলক্ষণা কন্যা জীবনে কখন দেখেন নাই। তাই রাজকন্যাকে বিয়ে করবার তাঁর লোভ হ'ল।

গণকঠাকুরের চোখের সামনে ভেসে উঠল, রাজকুমারীকে বিয়ে

ক'রে যেন তিনি রাজচক্রবর্ত্তী হয়েছেন, কত বিশাল তাঁর রাজত্ব, কত অফুরন্ত তাঁর ঐশ্বর্য্য। নাঃ!—স্বপ্নকে সফল করতেই হবে, যে প্রকারেই হোক্ না কেন।

ব্রাহ্মণ রাজার নিকট উপস্থিত হ'য়ে রাজকন্যার বিয়ের কথা তুলে কপট দুঃখে বললেন,—মহারাজ, আপনার কন্যাকে দেখলে কতই বুদ্ধিমতী ও সুলক্ষণা ব'লে মনে হয়, কিন্তু বিধাতা তার কপালে যে কত দুঃখ লিখেছেন তা বলবার নয়, আর লক্ষণও এত খারাপ যে, সে কথা আপনার না শোনাই ভাল।

গণকের মুখে কন্যার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে, রাজা মহাদুঃখিত হ'লেন, বললেন,—ঠাকুর, কোষ্ঠীতে আমার কন্যার দুর্ভাগ্যের কথা কি লিখেছে বলুন, আমি না শুনে স্থির হ'তে পারছি না।

গণকঠাকুর কপট দুঃখে বললেন,—বিবাহ-বাসরে বরের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা ত আছেই, তা ছাড়া রাজ্য ছারে খারে যাবে, শত্রুকুল আপনাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে শূলে চাপাবে।

রাজা প্রমাদ গণলেন। এ মেয়েকে ঘরে রাখা নিজের সর্ব্বনাশকে নিজে টেনে আনা। গণকঠাকুরের দুই হাত ধ'রে চোখের জল মুছে বললেন,—ঠাকুর, এ বিপদ হ'তে উদ্ধার হবার কি কোন উপায় নাই? যদি থাকে সে যতই কঠিন হোক্ না কেন, আমি এই দণ্ডেই তাই ক'রে রাজ্য, দেশ, মান, সম্ভ্রম, সব বজায় রাখব।

লোভী ব্রাহ্মণ দুঃখের ভান ক'রে বলতে লাগলেন,—মহারাজ!

বলব কি, বলতে বুক ফেটে যায়, আপনার কন্যাকে বাড়ি থেকে বিদায় করা ছাড়া গতি নাই।



নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে……

রাজা চমকে উঠলেন। কয়েক মুহূর্ত মাত্র নিস্তব্ধ থেকে বললেন,—দেখুন, আর কোন উপায় নেই কি?—শান্তি স্বস্ত্যয়ন করলে কি হবে না?

দৈবজ্ঞ কঠিন ভাবে কেবল মাথা নাড়লেন,—না। রাজা কোন কূল কিনারা না পেয়ে অবশেষে বললেন,—কোথায়, এবং কেমন ক'রেইবা রাজকন্যাকে দূর করতে হবে উপায় ব'লে দিন!

দৈবজ্ঞ সুযোগ বুঝে বললেন,—রাজকন্যার মাপে একটা কাঠের বাক্স তৈরী করা হোক্। তাতে নিঃশ্বাস ফেলবার জন্যে গুটিকত ছিদ্র রেখে, সেই বাক্সের মধ্যে সালঙ্কারা চঞ্চলাকে শুইয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হোক্। এতে চঞ্চলার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, আপনার দুর্ভোগ ঐখানেই কেটে যাবে, রাজ্য, দেশ, মান, সম্ভ্রম, এমন কি প্রাণ পর্যান্ত রক্ষা পাবে। কিন্তু সাবধান, রাণীকে এ সব ঘুণাক্ষরে জানাবেন না। আপনি উদ্যানবাটিতে সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে জলে ভাসিয়ে দেবেন।

যথাসময়ে বাক্স এসে উপস্থিত হ'ল। রাজকুমারী চঞ্চলাকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত ক'রে তাকে সেই বাক্সে লম্বভাবে শুইয়ে তালাবদ্ধ করা হ'ল। তারপর লোক ডাকিয়ে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিতে আজ্ঞা দিলেন।

রাণীর কানে যখন এ কথা উঠল, তখন রাণী কেঁদে বুক ভাসালেন। তিনি চতুর্দ্দিকে জেলে পাঠিয়ে দিলেন, ঘোষণা করলেন, যে রাজকন্যাকে জল থেকে তুলে আনতে পারবে, সেই রাণীর সমস্ত রত্ন মাণিক্য পুরস্কার পাবে।

এদিকে বাক্স নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলেছে। লোভী গণকঠাকুর ভেতরে ভেতরে সব খবর রেখেছিলেন। তাঁর কথা মত

চঞ্চলাকে বাক্সে পূরে নদীতে ভাসিয়ে দিতেই, সেই বাক্সকে ধরবার জন্যে তিনি নদীর কিনারা দিয়ে চলতে লাগলেন। বাক্সটা কিনারায় এলেই সেটাকে বাড়িতে নিয়ে ফেলবেন, এবং চঞ্চলাকে বিয়ে ক'রে একেবারে রাজচক্রবর্ত্তী হ'য়ে বসবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের এমন দুর্ভাগ্য যে, সেদিন স্রোতের বেগ হ'ল খুব প্রবল বাক্সটা যেন তীরের মত ছুটেছে। ব্রাহ্মণ অনেক ছুটেও সেটাকে ধরতে পারছেন না। দেখতে দেখতে বাক্সটা প্রখর স্রোতে একটা বাঁক ফিরল। ব্রাহ্মণ সেইদিক লক্ষ্য করবার সময় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এদিকে বাক্সটা বাঁকের মুখে আটকে যাওয়াতে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্র যুবকের চোখে সেটা প'ড়ে গেল। যুবক নদীর তীরবর্ত্তী জঙ্গলে শীকার করতে এসেছিল, এবং সেই জঙ্গলে একটা ভালুক ধ'রে সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে সেই নদীর বাঁকের মুখে বিশ্রাম করছিল। লোকজনেরা তার আদেশে সেটাকে ডাঙ্গায় তুলে যুবকের সামনে নিয়ে এল। যুবকের হুকুমে বাক্স খোলা হ'ল, দেখে, এক পরমাসুন্দরী কন্যা যেন নিদ্রিত রয়েছে। কন্যাকে ডাকা হ'ল, কোন সাড়া মিলল না। তার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেওয়ার পর রাজকন্যা জ্ঞান ফিরে পেল, ভয় হ'ল, এ সে কোথায় এসেছে। যুবকটি তাকে সাহস দিয়ে বললে,—কে আপনি? কোথায় আপনার বাড়ি? জানলে সেখানে আপনাকে রেখে আসব। ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা চঞ্চলার স্মরণ হ'ল। চঞ্চলার মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনে

যুবকটি বললে,—আপনি এখন কোথায় যেতে চান বলুন,—আপনি যা বলবেন আমি তাই করতে প্রস্তুত।

আমার আর কে আছে! আমি পিতার চক্ষুশূল হ'য়েছি! কেননা এক দৈবজ্ঞের গণনার ফলে তিনি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি সেখানে গিয়ে আমার পিতার অনিষ্ট করতে পারব না, সেখানে আমার স্থান নাই, তার চেয়ে এই বনেই আমি থাকব। ব'লে চঞ্চলা কাঁদতে লাগল।

যুবক বললে,—বেশ আমার গৃহেই চলুন, সেখানে আমার পিতা মাতা আপনাকে আশ্রয় দেবেন।

না, তা হয় না, কেননা, আমি যেখানেই যাব, তাঁদের অনিষ্ট হবে। এই কথা গণকঠাকুর বলেছেন।

যুবক বললে, মিথ্যা, মিথ্যা। মানুষ মাত্রেই ভুল করে, আপনার গণকঠাকুরের যে ভুল হয় নি, তারই বা প্রমাণ কি?

সত্যিই যদি হয়। ব'লে চঞ্চলা কাঁদতে লাগল।

রাজকুমারীকে অত্যন্ত কাতর দেখে যুবকের অন্তর বেদনায় ভরে গেল, বললে,—না—না—কিছু না! আমার ওখানেই চলুন।

যুবক ভালুকটাকে বাক্সের ভেতর পূরল, তালা বন্ধ করল, পরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে চঞ্চলাকে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

দৈবজ্ঞ এ সব কিছুই জানলেন না। কিছুদূরে বাক্সটা নদীর কিনারায় ভেসে যাচ্ছে দেখে, ছুটে এসে সেটাকে কাঁধে ক'রে বাড়িতে গেলেন, এবং চুপে সাড়ে একটা অন্ধকার খালি ঘরের মধ্যে রেখে দিলেন।

দৈবজ্ঞ ছেলেদের কাছে এ সকল কথা গোপন রেখে বললেন,—দেখ্, আজ রাত্রে আমি এই খালি ঘরে একটা ক্রিয়া করব, তা'তে এক



ভালুকটা ঘাড়ের রক্ত খেয়ে·

চীৎকার উঠবে, সে চীৎকার কানে গেলে সংসারের বড়ই অমঙ্গল হবে। তাই তোদের ব'লে দিচ্ছি, তোরা এই ঘরের বাইরে এমন জোরে কাঁসর ঘণ্টা বাজাবি যাতে ঘরের ভেতরের শব্দ বাইরে থেকে না শোনা যায়।

এই ব'লে দৈবজ্ঞ ঘিয়ের প্রদীপ, কোষাকুষী, গঙ্গাজল, শাঁক, ঘণ্টা, ফুল, বিল্বপত্র নিয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজায় খিল দিলেন। এদিকে তাঁর পাঁচ ছেলে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে সকলের কান ঝালা-ফালা করতে লাগল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে দৈবজ্ঞঠাকুর সেই যে ঘরে ঢুকেছেন, তার পরদিন বেলা ন'টা বেজে গেল, তবুও তাঁর বেরুবার নাম নাই। কাঁসর, ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে ছোট ভায়েদের হাত ভেরে গেছে, হাতে কড়া পড়ে গেছে, তবু বড়দাদার কাছে তাদের নিস্তার নাই। যত বলছে,—দাদা, আর পারি না, হাত ব্যথা হ'য়ে গেছে, হাতে কড়া প'ড়ে গেছে, বড়দাদা ততই তাদের ধমক দিয়ে বলছে,—বাজা! বাজা! খুব জোরে বাজা!

অনেক বেলা হ'য়ে গেল, রোদ্দুর ফুটে উঠল, তবু গণকঠাকুর ঘর থেকে বেরুলেন না। এমন সময় দৈবজ্ঞ গৃহিণী "রক্ত—রক্ত" ব'লে চীৎকার ক'রে উঠলেন। সবাই দেখলে, ঘরের নর্দ্দমা থেকে রক্ত গড়িয়ে আসছে। যাই দেখা অমনি কাঁসর ঘণ্টা সব থেমে গেল। কি হ'ল! কি হ'ল! রব প'ড়ে গেল।

বড় ছেলে বললে,—চুপ্ চুপ্! হবে আবার কি! বাবা ত বলেই রেখেছেন, তিনি একটা ক্রিয়া কচ্ছেন,—নিশ্চয় এ পাঁঠার রক্ত।

দ্বিতীয় ছেলে বলে উঠল,—বাবা ত রক্ত দেখলে ভিরমি যান, তিনি যে পাঁঠা কাটবেন এ কি কখন হতে পারে!

তৃতীয় পুত্র বললে,—ও আল্‌তা গোলা না হ'য়ে যায় না।

চতুর্থ পুত্র বললে,—কখনই নয়। আল্‌তাগোলার রং কখন কালচে হয় না,—থোল থোল্ চাপ বাঁধে না।

পঞ্চম পুত্র তখন হাত দিয়ে দেখে ভয়ে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল,—রক্ত! রক্ত! ডাহা রক্ত!

সকলে মিলে বাবা! বাবা! ব'লে দরজা ঠেলতে লাগল! বাবার সাড়াও নাই শব্দও নাই। কি যেন একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ আসতে লাগল। তখন বাধ্য হ'য়ে ব্রাহ্মণীর আদেশে দরজা ভাঙতেই, ফাঁক পেয়ে, ভালুকটা সকলের সামনে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। ছেলেরা তখন ঘরে ঢুকে দেখে সর্ব্বনাশ!—ভালুকটা তাদের বাপের ঘাড়ের রক্ত খেয়ে একদম্ মেরে ফেলে পালিয়েছে। ঘরের মেঝে রক্তা-রক্তি হ'য়ে নর্দ্দমায় গড়িয়ে এসেছে। ঘরের কোণে একটা মানুষ-সমান বাক্স ডালি খোলা প'ড়ে আছে।

ছেলেদের কান্নার শব্দে ব্রাহ্মণীও ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন। আশে পাশের প্রতিবেশীরা হঠাৎ কান্নার রব শুনে, কি হ'য়েছে! কি হ'য়েছে! ব'লে ছুটে দেখতে এল, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি কেউ কিছুই বুঝে উঠতে পারলে না। সকলেই বিস্ময়ে এ—ওর মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে যে যার স্থানে প্রস্থান করলে।

শোক কিছু উপশম হ'লে, জ্যৈষ্ঠ পুত্র রাজসমীপে উপস্থিত হ'য়ে, আকস্মিক ঘটনার কথা ব'লে খুব দুঃখ করলে।

এদিকে রাজকুমারী চঞ্চলাকে যুবক নদীতীর হ'তে তাঁর

বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অতি যত্নে রেখে দিলেন। পরে শুভদিন শুভক্ষণে যুবকের সহিত চঞ্চলার বিবাহ অতি সমারোহে নিষ্পন্ন হ'ল। বিয়ের পর হ'তেই যুবকের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হ'তে লাগল। দেখতে দেখতে রাজসিংহাসন লাভ ক'রে রাজচক্রবর্ত্তী হ'য়ে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

যখন যুবকের এরূপ উন্নত অবস্থা, সেই সময় একদিন চঞ্চলা স্বামীকে ধ'রে বসল,—বাপ-মাকে অনেক দিন ছেড়ে এসেছি, তাঁদের দেখবার জন্যে মনটা বড়ই অস্থির হ'য়েছে, তুমি যদি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও বড় ভাল হয়।

যুবক হেসে বললে,—আমায় আবার কেন, তুমি একা গেলেই ত পার।

আমার একা যেতে লজ্জা করে।

কেন?

তার মানে আছে।

তোমায় ধ'রে রাখবে এই না?

সম্ভব তাই।

তাতে ক্ষতি কি?

ক্ষতি আছে, তাইত তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে চাচ্ছি।

আমি গেলে কি হবে?

আমায় ধ'রে রাখতে পারবে না।

বুঝেছি,—তবে যাবার বন্দোবস্ত কিরূপ হবে?

অধীনস্থ রাজাকে যে ভাবে পত্র লিখতে হয়, সেই ভাবে বাবাকে পত্র লিখবে।

আচ্ছা তাই করা যাবে।

চঞ্চলার পিতার রাজ্যে মহা ধূম প'ড়ে গেছে। প্রধান প্রধান রাস্তায় বড় বড় তোরণ নির্ম্মিত হ'য়েছে,—সেই সব তোরণ লতা-পাতা ফল-ফুলে শোভিত করা হ'য়েছে, এবং স্থানে স্থানে সানাইয়ের মধুর ধ্বনির সঙ্গে কাড়া-নাকাড়া বাজছে। এত ধূমধামের মধ্যে রাজচক্রবর্ত্তী যুবক চঞ্চলাকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হ'ল। রাজা ও রাণী মহাসমাদরে উভয়কে অভ্যর্থনা করলেন। চঞ্চলার মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত। রাজা যুবকের হস্ত ধারণ ক'রে সভাস্থলে পণ্ডিতমণ্ডলী ও সমাগত সম্ভ্রান্ত গণ্য-মান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়ে যুবককে পরম আপ্যায়িত করতে লাগলেন; যুবকও যথাবিধি সৌজন্য দেখিয়ে সকলকে তুষ্ট করলেন।

বাহিরে এই, ভিতরে অন্দর মহলেও এই ব্যাপার চলেছে। রাণী চঞ্চলাকে মিষ্ট কথায় এবং নানাপ্রকারে তুষ্টি সম্পাদনে ব্যগ্র, কিন্তু চঞ্চলার মুখে কথা নাই। সে যে-ভাবে অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত ক'রে অন্দরমহলে এসেছিল, ঠিক সেই ভাবেই সে কালাতিপাত করতে লাগল, একটা কথা তার মুখ থেকে কেউ বার করতে পারলে না। এ অভদ্রোচিত ব্যবহারে উপস্থিত সকলেই ক্ষুণ্ণ হ'ল সন্দেহ নাই, কিন্তু সহসা এমন একটা ঘটনা

ঘটল যাতে সকলেরই ভ্রম ঘুচে গেল। সকলে দেখলে, সেই অবগুণ্ঠনের মধ্য হ'তে নবাগত রাণীর চোখের জলে তার বহুমূল্য পরিধেয় বস্ত্র আর্দ্র হয়ে গেছে। রাণী নিজেকে মহা অপরাধী মনে ক'রে চঞ্চলার দুই হাত ধ'রে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন,—আমরা গরীব,—নামে রাজা। আপনারা রাজচক্রবর্ত্তী,—সসাগরা পৃথিবীর রাজা,—আপনাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা! আপনাদের যোগ্য সম্ভ্রম দেবার ক্ষমতা আমাদের নাই। নিজগুণে দয়া ক'রে অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

ক্রন্দনরতা মাতার এরূপ কাতর বাক্যে চঞ্চলা নিজেকে গোপন রাখতে পারলে না। প্রাণের আবেগে বলতে লাগল,—মা! মা! আমি তোমার সেই হতভাগিনী মেয়ে! যাকে মা, বাক্সের মধ্যে পুরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলে!

ব'লে অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে মার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

মা অবাক দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর বোধ হ'তে লাগল, মেয়ে যেন স্বর্গরাজ্য থেকে নেমে এসেছে। মা বুঝে ঠিক করতে পারলেন না যে, যে-মেয়েকে তাঁরা নিজ হস্তে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল, সেই মেয়ে সাম্রাজ্ঞী কেমন করে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে রাজার কাছে খবর গেল। রাজা এসে মেয়েকে দেখেই তাঁর দুচোখ দিয়ে অবিরত ধারে আনন্দাশ্রু পড়তে লাগল। অতি কষ্টে চোখের জল মুছে বলতে লাগলেন,—আমরা তোর সর্ব্বনাশী মা-বাপ! তোকে বিসর্জ্জন দেবার পর হ'তে আমাদের প্রাণে সুখ নাই! তুই

মা আমাদের লক্ষ্মী ছিলি! তোকে পেয়ে আজ আমাদের বুকে বল



রাজা ও রাণী মহা সমাদরে উভয়কে অভ্যর্থনা করলেন⋯ ⋯

এল! বল্ মা বল্ সত্যিই কি তুই আমাদের বুকের ধন চঞ্চলা! আমরা ত তোকে দৈবজ্ঞের কথায় বাক্সে পূরে মারবার ফন্দিতে

নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম ! এখন কি ক'রে বেঁচে উঠে এমন রাজরাজেশ্বরী হ'লি মা !

রাজার মুখ দিয়ে আর কথা সরল না,—দুচোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

রাজা ও রাণী উভয়েই কেঁদে আকুল। পিতামাতার আকুল ক্রন্দনে চঞ্চলাও কেঁদে আকুল। সে এতদিনে বুঝলে তা'র মা-বাপ দৈবজ্ঞের হঠকারিতায় ভ্রান্তিবশে তাকে শত্রু ভেবে তার প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা দৈবজ্ঞের কুটবুদ্ধির পরিচয় কিছুই অবগত ছিলেন না ব'লেই এই অনিষ্ট ঘটেছে। অতএব এ সময়ে পিতামাতাকে সাবধান ক'রে না দিলে, ভবিষ্যতে আরও অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা। তাই বললে,—বাবা, দৈবজ্ঞেকে বিশ্বাস ক'রে আপনারা যে, আমার প্রাণ নাশের চেষ্টা করেছিলেন, তা আমি বুঝেছি। দুষ্ট লোকের সংসর্গ হ'তে দূরে থাকাই মঙ্গল,—কেননা, কখন্ কোন্ দিন একটা নূতন বিপদ এনে ফেলবে তার ঠিক নাই।

রাজা বললেন,—দৈবজ্ঞ তার প্রতিফল হাতে হাতে পেয়েছেন।

কি পেয়েছেন ?

বাক্সের মধ্যে একটা ভালুক ছিল, সেই ভালুক বাক্স থেকে বেরিয়ে দৈবজ্ঞকে মেরে ফেলে পালিয়েছে।

এই ব'লে রাজা দৈবজ্ঞের পুত্রের মুখ থেকে যে সব বৃত্তান্ত শুনেছিলেন, সেই সব ঘটনা ও দৈবজ্ঞের মৃত্যুকাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করলেন।

বুদ্ধিমতী চঞ্চলা সব বুঝে নিলে, এবং ভালুক-শীকারী যুবকের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যা যা ঘটেছিল, পিতাকে একে একে সব বললে।

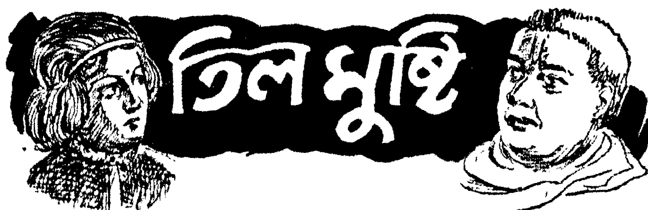
রাজা কন্যার মুখে সব কথা শুনে দৈবজ্ঞের আস্পর্দ্ধার কথা ভেবে ঘৃণায় মুখ বাঁকালেন, বললেন,—ঐ হতভাগা বামুনটা তোর কোষ্ঠী গণনা ক'রে, পরম ভাগ্যবতী দেখে তোকে বিয়ে ক'রে রাজচক্রবর্ত্তী হবার আশায় এই কূটজাল বিস্তার করেছিল। অতএব এর সবিশেষ বিবরণ না জেনে কিছুতেই মন স্থির হচ্ছে না।

আগে থেকেই রাণী দৈবজ্ঞকে দুচোখে দেখতে পারতেন না, রাজাকে সাবধান করলেও রাজা রাণীর কথা শুনতেন না, রেগে উঠতেন। এখন দৈবজ্ঞের কাণ্ড কারখানা হাতে হাতে ধরা পড়ায়, রাগে রাণীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল, রাগ সামলাতে না পেরে বললেন,—আমার কথা এখন ফলল ত! যতদূর ভোগবার তা ভুগলে ত!

ঠিক বলেছ রাণী! কি ভোগটা না ভুগ্‌ছি! তবে, ভগবানের কৃপায় চঞ্চলা মাকে যে পেয়েছি এই আমাদের পরম ভাগ্য! এখন আর একটু কাজ আছে, প্রথমে বাক্সটা দেখবার দরকার হ'য়েছে, কালই বাক্সটার সন্ধানে দৈবজ্ঞের ছেলেদের কাছে লোক পাঠাব।

পরদিন রাজা দৈবজ্ঞের বাড়িতে ভালুকের বাক্সটি আনতে লোক পাঠালেন, বাক্স এসে হাজির হ'ল। সকলে আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখলে, চঞ্চলাকে যে-বাক্স ক'রে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল,—এ সেই বাক্স।

যারা লোভী ও কুচক্রী তাদের পরিণাম কখনই ভাল হয় না।



সে অনেকদিনের কথা। ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা বারাণসীতে রাজত্ব করতেন। তাঁর একমাত্র পুত্র—ব্রহ্মদত্তকুমার—রাজারাণীর বড় আদরের।

দিন যায়। বারাণসীর প্রধান পণ্ডিতের কাছে রাজপুত্রের হাতে খড়ি হ'ল। মাত্র যখন তার বয়স যোল, তখন রাজ্যের প্রধান পণ্ডিতের কাছে বিদ্যাশিক্ষা শেষ হ'ল। এইবার রাজকুমারকে উচ্চ-শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় যেতে হবে। রাজজ্যোতিষী শুভদিন গণনা আরম্ভ করলেন।

তখন তক্ষশিলা ছিল আর এক রাজার অধিকারে। কিন্তু তবুও নানাদেশের রাজপুত্রেরা এখানে শিক্ষালাভ করতে আসত। কারণ তক্ষশিলা ছিল তখনকার কালে এক বিখ্যাত বিদ্যাকেন্দ্র। পৃথিবীর এমন কোন শাস্ত্র ছিল না, যা এখানে শিক্ষা দেওয়া হ'ত না। সুদূর চীন, যবদ্বীপ, আরব, তুর্কীস্থান থেকে কত ছাত্র এখানে জ্ঞান আহরণ করতে আসত। তাই ভারতের রাজপুত্রেরাও আসত।

ইহাতে রাজপুত্রেরা যেমন শারীরিক কষ্ট স্বীকার করতে শিখত, তেমনি নানাদেশের লোকের সহিত মেলামেশায় লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ও করত।



রাজকুমার একমুঠো তিল মুখে পুরলে

এক শুভদিনে শুভযোগে ব্রহ্মদত্তকুমার মাতাপিতার আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ ক'রে তক্ষশিলায় এল।

রাজকুমার তক্ষশিলার প্রধান আচার্য্যকে প্রণাম ক'রে বললে—ভগবন্, আপনার নিকট বিদ্যালাভের জন্য এসেছি। বিদ্যাদান ক'রে আমায় কৃতার্থ করুন।

আচার্য্য রাজকুমারের পরিচয় নিয়ে বললেন,—বৎস, দক্ষিণা বা গুরুশুশ্রূষা কোন্‌টির বিনিময়ে তুমি বিদ্যাশিক্ষা করতে চাও?

রাজপুত্র তখন আচার্য্যের পদতলে স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ একটি থলি রেখে বললে,—ভগবন্, আমি গুরুদক্ষিণা এনেছি।

আচার্য্য রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করলেন,—বৎস, তবুও তোমায় সাধারণ ছাত্রের মতই থাকতে হবে, রাজভোগ এখানে পাবে না।

শুক্লপক্ষে যে যে দিনে শুভযোগ থাকত, সেই সেই দিনে আচার্য্য সমীপে রাজকুমার পাঠ গ্রহণ করত।

রাজকুমারের ছাত্রজীবন বেশ কাটে।

একদিন রাজকুমার আচার্য্যের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে যাচ্ছিল,—পথে এক কুঁড়েঘরের সামনে এক বৃদ্ধা তিলের খোসা ছাড়িয়ে তিল রোদে দিচ্ছিল। বৃদ্ধাকে কিছু না ব'লে রাজকুমার এক মুঠো তিল নিয়ে মুখে পূরল। বৃদ্ধা ভাবলে, বোধ হয় ছেলেটির বড় ক্ষিধে পেয়েছে—সেজন্য চুপ করে রইল।

পরদিনও রাজকুমার আবার এক মুঠো তিল মুখে পূরল। সেদিনও বৃদ্ধা তাকে কিছুই বললে না।

বাধা না পেয়ে রাজকুমারের লোভ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। রাজকুমার ভাবলে, বোধ হয়, আমি রাজপুত্র ব'লে বৃদ্ধা ভয়ে কিছু

বলছে না। তৃতীয় দিনে রাজকুমার যেই তিল মুখে পুরল, অমনি বৃদ্ধা চীৎকার ক'রে উঠল। আচার্য্য পিছন ফিরে বললেন,—মা, তোমার কি হয়েছে?

বৃদ্ধা বললে,—প্রভু, আপনি কেমনতর আচার্য্য। ছাত্রদের দিয়ে আমার জিনিস লুঠ করাচ্ছেন।

আচার্য্য বললেন,—মা, তোমার কি জিনিস আমার ছাত্র লুঠ করেছে?

বৃদ্ধা বললে,—প্রভু, আপনার এই ছাত্রটি আজ তিন দিন ধ'রে আপনার সঙ্গে স্নানে যাবার পথে এক মুঠো ক'রে তিল মুখে পুরে। প্রথম দিন ভাবলাম, আহা বেছারির বড় ক্ষিদে পেয়েছে, তাই সে না ব'লে নিয়েছে। কালও যখন নিলে তখন ভাবলাম, আপনি বোধ হয় ছাত্রদের পেট ভ'রে খেতে দেন না, তা' না হ'লে চুরির লোভ আসবে কি করে? আজও যখন না ব'লে নিলে, ভাবলাম, আপনার উপদেশেই ছাত্রটি এমন কাজ করেছে। আমি এ বিষয়ে রাজদ্বারে নালিশ করব।

আচার্য্য বৃদ্ধাকে বললেন,—মা, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না। বেশ, তুমি কেঁদ না, তোমার তিলের দাম দিচ্ছি।

বৃদ্ধা বললে,—না, আমি তিলের দাম চাই না। আমি চাই আপনার এ ছাত্রের চরিত্র সংশোধন, এবং ছাত্রের চরিত্র সংশোধন করা আচার্য্যের কর্ত্তব্য নয় কি?

আচার্য্য বললেন,—মা, আমি তা জানি, গৃহে আমি উহাকে শাস্তি

দিতাম। কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসা করছি, তিলের মূল্যের পরিবর্ত্তে কি চাও বল?

বৃদ্ধা ভাবলে, হয়ত, গৃহে আচার্য্য ছাত্রকে শাস্তি দিবেন না, বললে,—আমার সামনে ইহাকে তিন বার বেত্রাঘাত করুন।

আচার্য্য বেত্রাঘাত করলেন। রাজপুত্র এতখানি আশা করেনি। রাগে, দুঃখে তার চোখ দুটি লাল হ'য়ে উঠল। আচার্য্যের দিকে সে একবার তাকালে,—সে চোখে দোষ স্বীকারের নম্রতা নাই,—আছে প্রতিহিংসার ভীষণ ছায়া। রাজপুত্রের চোখের ভাষা আচার্য্য বুঝলেন।

রাজপুত্র দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কালের বহু পূর্ব্বে পাঠ সমাধা করলে।

পাঠশেষে বিদায়ের দিন এল। রাজকুমার আচার্য্যের পাদবন্দনা ক'রে বললে,—গুরুদেব, আমি রাজপদ লাভ করলে, আপনার নিকট লোক পাঠাব, আশা করি, সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে আমায় কৃতার্থ করবেন।

এমন বিনয়ভাষণের অন্তরালে যে প্রতিহিংসার ছায়া তখনও রাজপুত্রের মুখে ফুটে উঠল—তা আচার্য্যের দৃষ্টি এড়াল না। আচার্য্য বললেন,—বৎস! নিশ্চয়ই যাব, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মন নির্ম্মল হোক্।

বারাণসীতে রাজপুত্র ফিরল। রাজ্যে উৎসব আরম্ভ হ'ল—ব্রহ্মদত্তকুমার এইবার যুবরাজপদে অভিষিক্ত হবে। দেশে দেশে

নিমন্ত্রণ গেল। সকলেই এল, কিন্তু আচার্য্য এলেন না। ব্রহ্মদত্ত কুমার এ অপমানের প্রতিশোধ নেবার প্রতীক্ষায় রইল।



আচার্য্য বেত্রাঘাত করলেন······

দশ বৎসর পরের কথা। আচার্য্য এখন খুবই বৃদ্ধ হয়েছেন,—তিনি ভাবলেন,—এতদিনে ব্রহ্মদত্তকুমার সময়ের গুণে শান্ত হ'য়েছে এইবার তাঁর যাওয়া উচিত।

একদিন বিনা নিমন্ত্রণে ব্রহ্মদত্তকুমারের প্রাসাদদ্বারে আচার্য্য এলেন। রাজার কাছে সংবাদ গেল,—তক্ষশিলার আচার্য্য তাঁর দর্শনপ্রার্থী।

অতি সমাদরে রাজসভায় আচার্য্য আনীত হলেন। কিন্তু একি!—রাজা তাঁকে দেখে ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন কেন? সে দিনের কথা কি তিনি এখনও ভুলেননি?

রাজা বললেন,—হে আচার্য্য, আপনাকে দেখে সে বেত্রাঘাতের জ্বালা আবার যেন নূতন ক'রে জাগল। তা ছাড়া, আপনার এত স্পর্দ্ধা, আমার নিমন্ত্রণ আপনি উপেক্ষা করবার সাহস রাখেন। আমি রাজা, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, আপনার এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করব, যাতে ইহলোকে কেহ আপনার অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না।—ঘাতক!

ঘাতক রাজার সামনে অভিবাদন করে বললে,—যা আজ্ঞা মহারাজ!

আচার্য্য ঈষৎ হাসলেন, বললেন—বৎস, দেখছি, তোমার এখনও রাগ যায়নি। তখন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিনি কেন যেন—প্রাণদণ্ডের ভয়ে নহে—তোমার প্রাণহানির ভয়ে।

কি এত বড় স্পর্দ্ধা! এমন অদ্ভুত কথাও কখন শুনিনি। একজন সামান্য আচার্য্যের কাছে ব্রহ্মদত্তকুমার প্রাণনাশের আশঙ্কা করবে। হোঃ হোঃ!

আচার্য্য বললেন,—শান্ত হও! সমস্ত ঘটনা খুলে বললে, তুমি বুঝতে পারবে। শোন রাজা, আমি যদি তোমায় ছাত্রাবস্থায়

ওভাবে শাসন না করতাম, তাহ'লে তুমি ক্রমশঃ অন্য নানা জিনিস চুরি আরম্ভ করতে। পরের জিনিস না ব'লে লওয়ার নাম চুরি। তুমি বৃদ্ধাকে না ব'লে যে তিন মুঠো তিল নিয়েছিলে, সেটাও চুরি। চুরির সামগ্রী যত সামান্য হোক্ না কেন, চুরি করার দণ্ড চোরের পাওয়া উচিত। যদি তোমার চুরি সামান্য ব'লে উপেক্ষা করতাম, আজ হয় ত তোমায় একজন রাজা রূপে না দেখে, দেখতাম চোর রূপে। সেজন্য দোষের মূলে উপযুক্ত শাস্তি দিলে, সে দোষ নির্ম্মূল হবার সম্ভাবনা বেশি।



বৎস, দেখছি তোমার এখনও রাগ যায় নি"

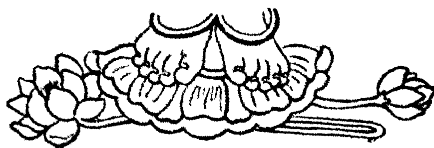
তা ছাড়া তোমার মনে গর্ব্ব ছিল, রাজপুত্র ব'লে সমাজ তোমার দোষ উপেক্ষা করবে,—কিংবা আমি তোমায় বেত্রাঘাত করতে

পারি, এমন কথা তুমি কল্পনাও কর নি। কিন্তু তোমার জানা উচিত,—শিক্ষালয়ে ছাত্রদের মধ্যে কোন সামাজিক ভেদ থাকতে পারে না, রাজার ছেলে আর সামান্য গৃহস্থের ছেলে দুজনেই শিক্ষকের কাছে সমান। রাজন্! আশা করি তুমি এখন বুঝতে পারলে বেত্রাঘাত করায় আচার্য্যের কোন দোষ হয়নি।

আমি জানতাম, রাজ্যাভিষেকে তুমি নিমন্ত্রণ করেছিলে, আমায় শ্রদ্ধা জানাবার জন্য নয়, আমায় হত্যা করবার জন্য। তখন তুমি ছিলে তরুণ,—তরুণ ভেবে-চিন্তে কাজ করে না, আমি যদি আসতাম, আমায় হত্যা করতে বাধত না। এদিকে আমার প্রাণবধের প্রতিশোধ নেবার জন্য তক্ষশিলার রাজা তোমার রাজ্য আক্রমণ করত, এবং হয় ত তোমার প্রাণহানি হ'ত।

কিন্তু আমি দুঃখিত, তুমি এখনও ক্রোধের বশীভূত আছ। ক্রোধ মহাপাপের মূল—ধ্বংসের মূল। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার সুমতি হোক্।

রাজার চোখের সামনে যেন কালো একখানা পরদা সরে গেল,—ভেসে উঠল জ্ঞানের আলোক রশ্মি। রাজা নত মস্তকে আচার্য্যের চরণে প্রণাম করলেন, বললেন,—আপনার আশীর্ব্বাদ অক্ষয় হোক্।



আজে বাজে বই - -
আমরা প্রকাশ করি না

পুস্তক তালিকা
পরপৃষ্ঠায় দেখুন





আমাদের বই নিঃশঙ্ক
চিত্তে ছেলেমেয়েদের
হাতে তুলে দেওয়া যায়